

নিবেদন

যুদ্ধ রাজনীতিকে বাদ দিয়ে নয়। সমরনীতি ও রাজনীতি অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত। অতএব সোভিয়েট যুদ্ধ বুঝতে হলে সোভিয়েট রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। সেজন্যই সোভিয়েট রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে ভিত্তি করে এই পুস্তক প্রণয়নের প্রয়াস পেয়েছি।

সোভিয়েট রাষ্ট্রের মূলে রয়েছে মার্ক্সবাদ। মার্ক্সবাদের তাত্ত্বিক দিক আলোচনা না করে তার বাস্তব রূপই দেখাবার চেষ্টা করেছি। সোভিয়েট রাষ্ট্রের বাস্তব রূপ সম্বন্ধে কেবল আমাদের দেশেই নয়, রুশ-জার্মান যুদ্ধ বাধার আগ পর্যন্ত জগতের অধিকাংশ দেশেরই জনসাধারণের মধ্যে অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক অজ্ঞতা ছিল। তদুপরি কায়েমী স্বার্থের ধ্বজাধারী বুদ্ধিজীবীরা জগদ্বাসীর চক্ষে সোভিয়েট শক্তিকে হেয় প্রতিপন্নের জন্য এমন নিরঙ্কুশ প্রচারকার্য চালান যার ফলে সাধারণ লোকের মনে সব অদ্ভুত ধারণার সৃষ্টি হয় এবং প্রগতিবিরোধী ব্যক্তিরা তার সম্বন্ধে নানারূপ উদ্ভট কথা বলে বেড়াবার সুযোগ পান। একথা সত্য সোভিয়েট ভূমি একেবারে স্বর্গরাজ্য হয়ে ওঠেনি বা পথ চলতে গিয়ে সেখানকার লোক যে কোন ভুলভ্রান্তি করেনি এমন কথাও হলফ করে বলা চলে না। কিন্তু সেটাই বড় কথা নয়; সমস্ত ভুলভ্রান্তি অতিক্রম করে তারা যে বিরাট শক্তি অর্জন করেছে—জগৎকে গণমুক্তি ও মানবকল্যাণের যে প্রশস্ত ও ঋজু পন্থা তারা দেখিয়েছে—সেটাই আজ সব চেয়ে বড় সত্য।

অখণ্ড-হিন্দুস্থান, পাকিস্থান প্রভৃতি নিয়ে আমাদের দেশের এক দল লোক বড় বেশী মাতামাতি করেন এবং জনসাধারণের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়ান। কোন সম্প্রদায় বা জাতি আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার চাইলে কোনক্রমেই তা অগ্রাহ্য করা চলে না; কিন্তু স্বার্থান্বেষী ও প্রভুত্বপ্রয়াসী প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃবর্গের মধ্যে চুক্তি হলেই কোন সম্প্রদায় বা জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের যথার্থ অধিকার লাভ হয় না। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে জনসাধারণের অধিকার স্বীকার করে কিভাবে প্রত্যেক জাতি ও সম্প্রদায়কে [illegible] অধিকার [illegible] দেওয়া হয়েছে, তাই আজ আমাদের দেশের [illegible] বেশী

করে ভেবে দেখা উচিত। কোন দেশ বা জাতিকেই সেখানে জোর করে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত করে রাখা হয় নি; যে কোন য়ুনিয়ন রিপাব্লিক ইচ্ছে করলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে পারে।* কিন্তু সম্পর্ক কেউ ছেদ করে না। তারা জানে সমগ্র সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের মঙ্গলেই তাদের মঙ্গল। সোভিয়েটবাসীদের মধ্যে এই ঐক্যবোধ একান্ত সহজ এবং অত্যন্ত তীব্র বলেই বিরাট এলাকা দখল করেও হিটলার সোভিয়েট ভূমিতে 'কুইসলিং' শ্রেণীর কোন বিশ্বাসঘাতক খুঁজে পান নি।

সোভিয়েট শক্তি আজ জগতের বিস্ময়। তার সম্বন্ধে লোকের কৌতূহলেরও অবধি নেই। সকল কৌতূহলের নিবৃত্তি করতে গেলে বিরাট গ্রন্থের প্রয়োজন; এই ক্ষুদ্র পরিসরে তা সম্ভব নয়। তবে সোভিয়েট যুদ্ধকে যথার্থ হৃদয়ঙ্গম করতে হলে যেটুকু পটভূমি জানা একান্ত আবশ্যক এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে তা দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। সাফল্যের বিচারক পাঠকবর্গ।

অবশেষে একটি কথা বলেই আমার নিবেদন শেষ করব। এই পুস্তকরচনায় হাত দেবার সঙ্গে সঙ্গেই বাজারে কাগজ একেবারে দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠে। তদুপরি কলিকাতায় জাপানী বিমানের হামলা সুরু হয়। তার ফলে নানা বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়ে আমাকে এই পুস্তক শেষ করতে হয়েছে। সুতরাং কোন ত্রুটি থাকা অসম্ভব নয় এবং তা থাকলে পাঠকবর্গ নিশ্চয়ই সেজন্য আমাকে ক্ষমা করবেন। বোমাসঙ্কটের মধ্যেও প্রেসের পরিচালক এবং কর্মচারীবৃন্দ এই পুস্তক প্রকাশে যেভাবে সহযোগিতা করেছেন তজ্জন্য তাদেরকে আমার অশেষ ধন্যবাদ।

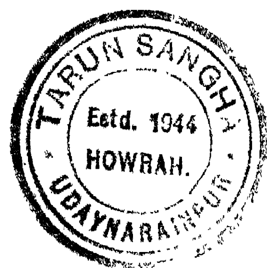
ইতি—

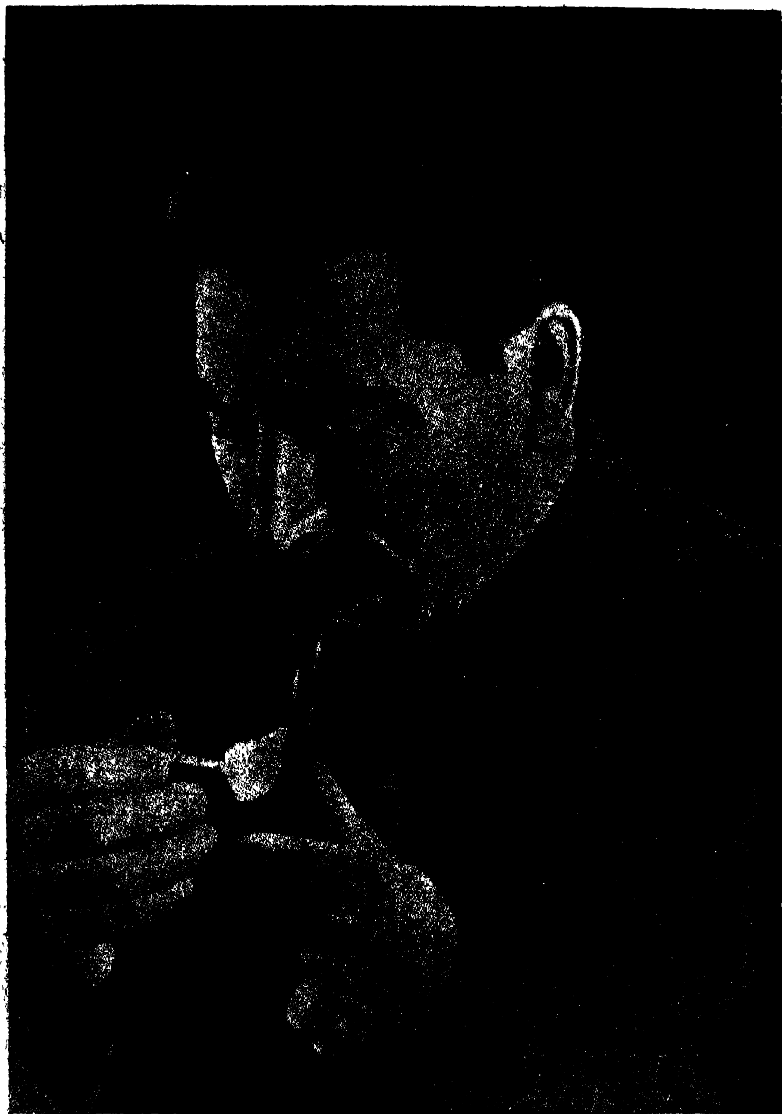
কলিকাতা, ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩। **গ্রন্থকার**

* To every Union Republic is reserved the right freely to secede from the U. S. S. R. [*Article XVII of the Constitution of the U. S. S. R. of 1936*].

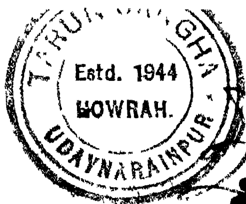
সূচিপত্র

মহাযুদ্ধে সোভিয়েট





সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণধার মঃ ষ্ট্যালিন





মহাযুদ্ধে সোভিয়েট

সোভিয়েট শক্তির উৎস

প্রায় পঁচিশ বছরের চেষ্টায় সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র মানব সভ্যতার ইতিহাসে যে নতুন অধ্যায় রচনা করেছে, ফাসিস্ত শক্তি আজ তার বিলোপসাধনে কৃতসংকল্প। পৃথিবীতে এত বড় যুদ্ধ ইতিপূর্বে হয় নি ; অপরিমেয় বিনাশ ও অনমুমেয় হিংস্রতার দিক দিয়ে এ সকল যুদ্ধকে অতিক্রম করেছে। সার্বিক যুদ্ধের বিষম আবর্তনে রাষ্ট্রের সর্বশক্তি যুদ্ধমুখীন হয়ে উঠেছে। উভয় পক্ষই চরম অবস্থার জন্য প্রস্তুত। বিবদমান দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যে যেমন মাঝপথে আপোষ হওয়া সম্ভব, এক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। এ সংঘাত দুই পরস্পর বিরোধী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে। একের অস্তিত্ব অন্যের ধ্বংসের কারণ। এ যুদ্ধে ফাসিস্ত পক্ষের পরাজয় ঘটলে রণক্লান্ত জনসাধারণ স্বভাবতই ফাসিস্ত পন্থার প্রতি বিরূপ হয়ে উঠবে এবং যুদ্ধের অপরিহার্য পরিণতি আর্থিক দুর্গতি ও বেকার সমস্যার দরুণ য়ুরোপে সাম্যবাদের অনুকূল আবহাওয়া দেখা দিবে। গত মহাযুদ্ধের পরও জার্মানীতে লোক ঠিক এ অবস্থায় পড়ে সাম্যবাদকামী হয়ে উঠেছিল। পশ্চিম য়ুরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধনপতিরা সেদিন জার্মানীতে মূলধন পাঠিয়ে তথাকার ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিপতিদের বাঁচাবার চেষ্টা না করলে ইতিহাস হয়ত আজ অন্যরূপ হয়ে দাঁড়াত। অর্থনৈতিক স্থূল বিচারে

অবশ্য মনে হয়, যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ আদায়ের উদ্দেশ্যেই গত মহাযুদ্ধের বিজয়ী পক্ষ ভার্সাই সন্ধির পর জার্মানীতে অর্থ ঢেলে তথাকার শিল্পপতিদের জিইয়ে রাখবার চেষ্টা করে। অর্থাৎ এক হাতে সাহায্য ক'রে তারা আর এক হাতে তা কেড়ে নেওয়ার প্রয়াস পায়। কিন্তু কূটনৈতিক সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখলে একথা বলা ছাড়া উপায় থাকে না যে, আর্থিক দুর্গতির দরুণ জার্মানীতে পাছে পুঁজিবাদের অবসান ঘ'টে সোভিয়েট তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়, এ আশঙ্কায়ই বিজয়া পক্ষের পুঁজিবাদীরা সেদিন জার্মান শিল্পপতিদের অর্থসাহায্য করার জন্য বেশী ব্যগ্র হয়েছিলেন। জার্মানীতে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার দুশ্চিন্তায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের শাসকগণ পুঁজিবাদীদের অঙ্গুলিসংকেতে সেদিন যা করেছিলেন, আজ এ মহাযুদ্ধ তারই পরিণতি। জার্মানীতে তখন ক্ষীয়মান পুঁজিবাদ পুনরায় মাথা চাড়া দিয়ে ওঠবার সুযোগ না পেলে হিটলারের অভ্যুত্থান সম্ভব হত কিনা সন্দেহ এবং এ মহাযুদ্ধও হয়ত আজ বাধত না। মানবজাতির ইতিহাসে এ এক বিষম কলঙ্ক।

জার্মানীর পরাজয় ঘটলে যেমন সোভিয়েটতন্ত্রের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তেমনি তার বিজয়ের দ্বারা ফল বিপরীত হয়েও দাঁড়াতে পারে। নাৎসী জার্মানী যদি বিজয়ী হয় তবে বর্তমান সোভিয়েট রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য। মানুষের মনে সোভিয়েট আদর্শ বেঁচে থাকতে পারে, কিন্তু তার বাস্তবরূপ লোকচক্ষুর অগোচর হবে। আদর্শ যত বড়ই হোক, সামরিক বলের কাছে কোন রাষ্ট্রের পরাজয় এবং বিজয়ীর ইচ্ছানুযায়ী বিজিত দেশে চিরস্থায়ী না হলেও সাময়িক ভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন ইতিহাসে কিছু নতুন নয়। সোভিয়েট রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় তথাকার লোকের মনে

যে সামাজিক বোধ জেগেছে এবং যে শ্রেণীবৈষম্যের মনোভাব লোপ পেতে চলেছে, সোভিয়েট শক্তির পরাজয় ঘটলে বাইরের ইন্ধন ও প্ররোচনায় সেখানে এই সামাজিক বোধ বিস্মৃত হয়ে লোকের মনে আবার গণস্বার্থের পরিবর্তে শ্রেণীস্বার্থের চেতনা আসা কিছু অসম্ভব নয়। সেদিন সোভিয়েট রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে তার সমাজব্যবস্থাও ভেঙ্গে পড়বে। তেমন দুর্দিনের হাত হতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যই আজ সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের আপামর জনসাধারণের এই মরণপণে সংগ্রাম। যে মুক্তির আস্বাদ তারা পেয়েছে তা থেকে বঞ্চিত হলে তাদের অদৃষ্টে যে অশেষ দুর্গতি রয়েছে, এ সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ সচেতন। সোভিয়েট জনসাধারণ জানে, তাদের এ যুদ্ধ পুঁজিবাদীর স্বার্থরক্ষা বা শাসকবর্গের খেয়াল চরিতার্থের জন্য নয়; প্রত্যেক সোভিয়েট পরিবার রক্ষার প্রশ্ন এর সঙ্গে বিজড়িত। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে কোন জমিদার নেই, সমগ্র জমি জনসাধারণের। কাজেই প্রত্যেক সোভিয়েট প্রজাই মনে করে শত্রুর আক্রমণ হতে সে তার নিজেরই জমি রক্ষা করছে। সেখানে কারখানাসমূহের কোন ব্যক্তিগত মালিক নেই; কারখানাগুলি জনসাধারণের সম্পত্তি। সুতরাং প্রত্যেকেই মনে করে শত্রুর আক্রমণ হতে সে তার নিজেরই কারখানা রক্ষা করছে। সর্বোপরি সেখানকার জনসাধারণ জানে যে, সোভিয়েট রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় তাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে অল্পদিনের মধ্যে কি বৈপ্লবিক উন্নতি হয়েছে এবং এ সম্বন্ধে তারা সচেতন বলেই আজ সর্বস্ব পণ করে আত্মরক্ষায় তারা বদ্ধপরিকর।

সোভিয়েট শক্তির উৎসের সন্ধান করতে হলে জনসাধারণের অর্থনৈতিক উন্নতিকল্পে তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে শিল্পায়নের কথা সর্বাগ্রে বলতে হয়। জারের আমলের ন্যায় সোভিয়েট আমলেও

যদি রুশিয়ার শিল্প কেবল য়ুরোপীয় রুশিয়ায়ই কেন্দ্রীভূত থাকত তবে জার্মান বাহিনীর প্রবল আঘাতে সোভিয়েট শক্তি হয়ত অল্পদিনেই ভেঙ্গে পড়ত। কিন্তু সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে শিল্পোৎপাদনের ব্যবস্থা কেবল লেনিনগ্রাড, মস্কো, কিয়েফ বা খারকফেই সীমাবদ্ধ নয়; উত্তরে তুষারাবৃত সুমেরু অঞ্চল হতে দক্ষিণে গর্ণো বাদাকশান এবং পূর্ব দিকে সাইবেরিয়ার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এখন সোভিয়েট শিল্প বিস্তৃত। জারের আমলে যে-সকল এলাকা উপনিবেশ হিসাবে কেবল কাঁচা মালই যোগাত, আজকাল সেই সব এলাকায় বড় বড় সব শিল্পকেন্দ্র গড়ে উঠেছে। কৃষিপ্রধান এলাকায়ও শিল্পের প্রবর্তন হয়েছে; অনাবাদি তৃণভূমিতে আজ সোণা ফলছে; মরু অঞ্চলে সুরম্য অট্টালিকাপূর্ণ সহর দেখা দিয়েছে; অজ্ঞাত ও অনাদৃত প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহারে লোকের আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন উন্নত হয়েছে। অর্থনৈতিক, শৈল্পিক ও সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত না করে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সুদূর প্রান্ত পর্যন্ত যে তাকে সম্প্রসারিত করে দেওয়া হয়েছে তারই মধ্যে সোভিয়েট রুশিয়ার মূল শক্তি নিহিত।

সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ যে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীন উন্নতি বিধানের জন্য তিন তিনবার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন তার একটা প্রধান উদ্দেশ্যই হল শিল্প প্রচেষ্টাকে দেশের সর্বত্র সম্প্রসারণ এবং সমবেত চেষ্টায় ঐকত্রিক সমৃদ্ধি সাধন করা। এই প্রচেষ্টার ফলে কেবল যে প্রাচীন শিল্পকেন্দ্রগুলিই পুনর্গঠিত হয়েছে এমন নয়, পরন্তু নানাস্থানে প্রাকৃতিক সম্পদকে অবলম্বন করে নতুন নতুন শিল্পকেন্দ্রও গড়ে উঠেছে। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে যখন প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনানুযায়ী কাজ আরম্ভ হয় তখন শিল্প-সম্পদের দিক দিয়ে জগতে সোভিয়েট

যুক্তরাষ্ট্রের স্থান ছিল পঞ্চম। তারপর পাঁচ বছর অন্তেই সে জগতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনানুযায়ী কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর তার স্থান হয় দ্বিতীয়। লেনিন এক সময় বলেছিলেন, "রুশিয়ার অবস্থা ইংলণ্ডের তুলনায় চারগুণ, জার্মানীর তুলনায় পাঁচগুণ এবং আমেরিকার তুলনায় দশগুণ খারাপ।" আর বিপ্লবের পর পুনর্গঠনের ফলে সেই রুশিয়া অর্থনৈতিক ভিত্তিতে আমেরিকার পরই স্থান লাভ করে; য়ুরোপে তার সমকক্ষ কেউ নেই।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে মঃ ষ্ট্যালিন কম্যুনিষ্ট পার্টির ষোড়শ অধিবেশনে অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনায় বিজ্ঞানসম্মত ভৌগোলিক ভিত্তিতে শিল্পোৎপাদনের সুব্যবস্থাকে প্রাধান্য দেন। শিল্পোৎপাদনের প্রণালী পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পব্যবস্থা বণ্টনের পরিবর্তনও আপনা হতেই হয়ে যায়। লেনিন যে সমস্যার কথা বলেছিলেন তা এ ভাবে সমাধানের ব্যবস্থা হয়ঃ—

> "কাঁচা মাল হতে শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনে যে-সকল প্রণালীর মধ্য দিয়ে যেতে হয় তাতে সর্বদাই লক্ষ্য রাখতে হবে যে, কাঁচা মাল উৎপাদনক্ষেত্রের যত নিকটে সম্ভব কারখানা স্থাপন করত যাতে শ্রমশক্তির অপচয় না হয় সেভাবে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে রুশিয়ার শিল্পব্যবস্থাকে বণ্টন করতে হবে।"

এই নীতি অবলম্বনের ফলে যেখানে কাঁচা মাল পাওয়া যায়, যথাসম্ভব তারই নিকটে নতুন নতুন কারখানা সব গড়ে উঠল। তাতে উৎপাদনের পথ সহজ হয়ে এল এবং শ্রমশক্তিরও অপচয় কমল। শিল্পোৎপাদনের জন্য যাতে কাঁচা মাল নিয়ে অধিক দূরে

না টানাটানি করতে হয় তদুদ্দেশ্যে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ প্রাকৃতিক সম্পদ আবিষ্কারের নিমিত্ত বৈজ্ঞানিকদের নিয়োজিত করলেন এবং তাঁরা নিত্য নতুন আবিষ্কারে নতুন নতুন এলাকায় শিল্প-সম্ভাবনার সন্ধান দিলেন। এর ফলে নবাবিষ্কৃত অনুকূল সম্পদরাশির সমাবেশে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বিস্তীর্ণ বক্ষে এমন সব বিরাট শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে পূর্বে যা কেউ কল্পনাও করতে পারে নি। এভাবে প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ অনগ্রসর এলাকায় সোভিয়েট শিল্প প্রবেশ করেছে: কোথাও সেই সব সম্পদের সন্ধান ইতিপূর্বে কেউ পায় নি; আবার কোথাও পেয়ে থাকলেও তা অনাদৃত অবস্থায়ই পড়ে ছিল। জারের আমলের শাসকবর্গ তা আহরণের চেষ্টা করেন নি এবং সেজন্যই ওই সব অঞ্চলের অধিবাসীদের আর্থিক দুর্গতিরও অবধি ছিল না।

জারের আমলে যে-সকল অঞ্চল রুশিয়ার উপনিবেশে পরিগণিত ছিল এবং যেখানে শোষণ ছাড়া এক বিন্দু সরকারী অনুগ্রহও বৃষ্টি হত না, সেই সব অঞ্চলের অধিবাসীদের সাংস্কৃতিক অপকর্ষ আজ তাদের অর্থনৈতিক দৈন্য ঘুচবার সঙ্গে সঙ্গেই বিদূরিত হয়েছে। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে কম্যুনিষ্ট পার্টির দ্বাদশ অধিবেশনে মঃ ষ্ট্যালিন বলেন,—

> "সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অনগ্রসর রিপাব্লিকগুলির সুদূর প্রান্ত-স্থিত জেলাসমূহে বিদ্যালয় স্থাপন ও শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে রুশ সর্বহারাদের এও দেখতে হবে যে, ওই সব অঞ্চলে শিল্পকেন্দ্রও যেন ব্যাপকভাবে স্থাপিত হয়। কেন না, তাদের অনুন্নত অবস্থার জন্য তারা নিজেরা দায়ী নয়; কেবল কাঁচা মালের যোগানদার হিসাবে তাদের আগে দেখা হত বলেই আজ তাদের এ অবস্থা। এর অবসান করতেই হবে।"

. এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্যই সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে কৃষি, শিল্প ও যানবাহন চলাচলের নতুন ব্যবস্থা করা হয়। তদনুসারে বিভিন্ন এলাকায় শিল্পোৎপাদন কেন্দ্র ছড়িয়ে পড়ে। কেবল তাই নয়; উৎপাদনের প্রধান শক্তি জনবলের বণ্টনও সেই অনুসারে হয়। এই পুনর্গঠনের ফলে সেখানে জনসংখ্যা অতিশয় দ্রুতগতিতে বেড়ে চলে। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের হিসাবেই দেখা যায়, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে বছরে প্রায় ত্রিশ লক্ষ অর্থাৎ দৈনিক আট হাজার করে লোক বেড়ে যাচ্ছে। এই হার তারপর আরও বেড়ে গিয়েছে। বলশেভিক বিপ্লবের আগে রুশিয়া বাদে সমগ্র য়ুরোপে যত লোক বাড়ত, রুশিয়ায় বৃদ্ধি হত তার তিন ভাগের এক ভাগ। আর ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের হিসাবে দেখা যায়, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বার্ষিক লোকবৃদ্ধি সমগ্র য়ুরোপের বার্ষিক লোকবৃদ্ধির প্রায় সমান; অথচ য়ুরোপের লোকসংখ্যা সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের লোকসংখ্যার প্রায় সওয়া দুই গুণ। এত দ্রুত জনবল বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র যে অর্থনৈতিক সঙ্কটে পড়ে নি তার কারণ জনবল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেখানে সম্পদ বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং সম্পদ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জনবল বেড়ে চলেছে।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে ভৌগোলিক ভিত্তিতে শ্রম বণ্টন করায় অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সব চেয়ে আশ্চর্য রূপান্তর ঘটেছে প্রান্তিক অনগ্রসর এলাকাগুলির। পশুপালক এবং অজ্ঞ কৃষককুল সংস্কারমুক্ত হয়ে জীবিকার্জনের নতুন পন্থা গ্রহণ করেছে। কল-কারখানা এবং যন্ত্রপাতির প্রতি তারা আর এখন বিমুখ নয়। নতুন জীবন লাভ করে তারা সুদক্ষ যান্ত্রিক সেজেছে। বিজ্ঞানের আবেদন তাদের কাছে গিয়েও পৌঁচেছে এবং সেই আবেদনে তারা সাড়া দিয়েছে বলেই সোভিয়েট যুদ্ধ সত্যিকারের জনযুদ্ধে পরিণত হয়েছে।

নতুন ভাবে শিল্প বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে লোক-বিস্তারও হয়েছে নতুন ভিত্তিতে। প্রাচীন রুশিয়ায়ও স্থান হতে স্থানান্তরে গিয়ে লোক বসবাস করত; কিন্তু তার মূলে ছিল একটা শোষণ ব্যবস্থা। অগ্রসর সমাজের লোকেরা অনগ্রসর সমাজকে শোষণ করতে গিয়ে এমন উৎপীড়ন আরম্ভ করত যে, অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে লোক তখন স্থানান্তরে চলে যেতে বাধ্য হত। অনগ্রসর এলাকায় লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হত খুবই কম। উত্তর রুশিয়ার ছোট ছোট জাতিগুলি একরকম লোপ পেতেই বসেছিল। জারের আমলের সরকারী নথিপত্রেই স্বীকৃতি রয়েছে যে, কতগুলি উপজাতি একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়েছে। কিন্তু সোভিয়েট আমলে একটি জাতিরও নিশ্চিহ্ন হওয়ার আশঙ্কা নেই। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যেক জাতিরই লোকসংখ্যা বাড়ছে।

কাজাক, কিরগীজি, তুর্কী, কালমুক, অয়রট, বুরিয়াট, ইভেঙ্ক প্রভৃতি সবই ছিল এককালে যাযাবর জাতি। দেশের প্রায় তিন চতুর্থাংশ এলাকাই ছিল এদের বিচরণভূমি। প্রায় এক কোটি লোক তাদের গোমহিষ, ছাগলভেড়া নিয়ে স্থান হতে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়াত। শতচ্ছিদ্র তাঁবুতে ছিল তাদের বাস এবং দারিদ্র্য ও অনাহার ছিল তাদের নিত্য সহচর। এই প্রাগৈতিহাসিক জীবনযাত্রাপ্রণালী তাদের সেদিনও পর্যন্ত চলে আসছিল। জারের আমলের গবর্ণমেণ্ট তাদের উন্নতির জন্য কোন চেষ্টাই করে নি। তখন বলা হত, কিরগীজের যাযাবরগণ তাদের ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে খৃষ্টান হলে বসত পেতে পারে। সেই আমলের রুশদের প্রাধান্য বিস্তারের পন্থাই ছিল এই। কোন যাযাবর প্রাচীন রুশিয়ায় বসত পেলে তার গোমহিষাদি পালন করে স্বাধীন জীবিকার্জনের পথ বন্ধ হয়ে যেত;

কারণ রুশ উপনিবেশীগণ তার ভাল গবাদি পশু সব নিয়ে নিত। কিন্তু সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে সেই যাযাবর জাতি এখন বসত স্থাপন করে গৃহবাসী হয়েছে। গোপালন ও মেষপালনই এককালে যাদের একমাত্র জীবিকার্জনের উপায় ছিল আজ তারা শিল্প ও উন্নত কৃষি ধরেছে এবং তাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আর্থিক জীবনের অনেকখানি উন্নতি হয়েছে। সরকারী ব্যয়ে তাদের বসতগুলি সুসংবদ্ধভাবে গড়ে উঠেছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়ই লক্ষাধিক যাযাবর পরিবার স্থায়ী বসত স্থাপন করেছে। যে সমস্যার কোনদিন সমাধান হয় নি, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র অকর্ষিত জমিতে যাযাবর জাতির জন্য যৌথ চাষবাসের ব্যবস্থা করে দিয়ে সেই সমস্যার সমাধান করেছে। বসত স্থাপন করেও যাযাবররা তাদের পশুপালন ব্যবসা ছেড়ে দেয় নি; বরঞ্চ তার আরও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। পশুগুলি আগে খোলা মাঠেই থাকত এবং বরফ পড়লে ঘাসের খুবই অসুবিধা হত; কিন্তু এখন সরকারী খরচে পশুর জন্য সব চালাঘর নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া কেবল কাঁচা ঘাসের ওপরই আজকাল আর নির্ভর করতে হয় না, খন্দের সময় ঘাস শুকিয়ে গাদা করে রাখা হয়। কেবল তাই নয়, সমবায় পদ্ধতিতে তারা এখন ঘাসের চাষও করে। যাযাবরদের আগে জীবনে মাত্র দু'বার স্নানের রীতি ছিল জন্মের পর এবং মৃত্যুর পর; তারা ছিল একেবারে নিরক্ষর; মুর্খ ওঝারা ছিল তাদের চিকিৎসক। এখন তাদের বসতগুলিতে স্নানাগার, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় কিছুরই অভাব নেই। নিরক্ষরতা একরূপ বিদায় নিয়েছে বললেই চলে। চিরভ্রাম্যমান গৃহহীন যাযাবর জাতি আজ সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে ইমারতবাসী গৃহস্থ পরিবারে পরিণত হয়েছে।

নতুন বসতগুলিতে প্রচুর পরিমাণে শাকশব্জীর চাষ হচ্ছে এবং

সেখানে সব শস্যভাণ্ডার স্থাপিত হয়েছে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের এক প্রান্ত হতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত আজ কৃষিক্ষেত্র বিস্তৃত। বিজ্ঞানের সাহায্যে মরু ও পার্বত্য অঞ্চলে ফসলোৎপাদনের ব্যবস্থা হয়েছে। ফলে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের লোকবণ্টনও নতুন ভিত্তি লাভ করেছে। উত্তর এবং পূর্বদিকে শিল্পের সম্প্রসারণ হওয়ায় লোক সেদিকে বিস্তার লাভ করে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলে সমগ্র সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা ১২ জন লোকবৃদ্ধি হয়; সেই তুলনায় পূর্বাঞ্চলের লোক বৃদ্ধি হয় শতকরা ২৪ জন। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ হতে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর প্রান্তিক এলাকায় লোকসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে যায়। জোর করে এক স্থান হতে অন্য স্থানে লোক পাঠিয়ে যে অনগ্রসর এলাকায় লোকসংখ্যা বাড়ান হয়েছে এমন নয়। অনাবাদি ও অনধ্যুষিত অঞ্চলে শিল্প ও কৃষির ব্যবস্থা হওয়ায় লোক স্বেচ্ছায় জীবিকার্জনের জন্য সেখানে গিয়ে বসত স্থাপন করেছে। অবশ্য রাষ্ট্র থেকে তারা এই স্থানান্তরে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছে। তাদের নতুন বসতে বাড়ীঘর নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে এবং রাষ্ট্র তাদের শিল্পোৎপাদন ও চাষের জন্য যন্ত্রপাতি যুগিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে তারা রাহা খরচও পেয়েছে। রাষ্ট্র এতখানি সাহায্য করেছে বলেই উত্তরে সুমেরু অঞ্চল এবং সুদূর প্রাচ্যের কামচট্‌কা অন্তরীপে পর্যন্ত আজ বসত স্থাপিত হয়েছে। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রায় ১৫ হাজার লোক গিয়ে উক্ত অন্তরীপে বসত স্থাপন করে।

বলশেভিক বিপ্লবের আগেও রুশিয়ায় লোক স্থানান্তরে গিয়ে বসত না করত এমন নয়; কিন্তু তখন লোক স্থানান্তরে যেত প্রধানত নতুন কৃষিক্ষেত্র পাওয়ার আশায়। অনেক ক্ষেত্রেই অবস্থাপন্ন কৃষকরা গিয়ে দরিদ্র চাষীদের ভাল জমিগুলিকে কেড়ে নিত। দরিদ্র চাষীরা

উৎখাত হয়ে হয় সেখান থেকে অন্যত্র সরে পড়ত, আর তা না হলে অবস্থাপন্ন জোতদারদের অধীনে তাদের দাসজীবন যাপন করতে হত। কিন্তু সোভিয়েট আমলে লোক স্থানান্তরে গিয়ে বসবাস করছে প্রধানত শিল্পের আকর্ষণে। কাউকে বঞ্চিত করার প্রশ্ন তাতে আসে না। খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ যে-সকল এলাকা জারের আমলে অবজ্ঞাত ও উপেক্ষিত হয়ে পড়েছিল সেই সকল জনবিরল এলাকায় সোভিয়েট আমলে নতুন শিল্পকেন্দ্র গড়ে ওঠায় লোক স্বেচ্ছায় ও সানন্দে জীবিকার্জনের জন্য সেখানে গিয়ে বসত স্থাপন করেছে। এদ্বারা স্থানীয় কোন সম্প্রদায় বা জাতি বঞ্চিত হয় নি। বরঞ্চ নতুন শিল্পকেন্দ্র স্থাপিত হওয়ায় স্থানীয় লোক উপকৃতই হয়েছে। জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলেই জাতীয় সম্পদের সমান অধিকারী।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবের আগে রুশিয়ায় ইহুদীদের ওপর নানা ভাবে নিপীড়ন হত। অথচ তারাই ছিল সমগ্র রুশিয়ার জনসংখ্যার শতকরা প্রায় দুই ভাগ। কৃষিকাজ করার কোন অধিকার তাদের ছিল না এবং সরকারী নির্দিষ্ট এলাকার বাইরে তারা বসবাস করতে পারত না। সামান্য দু'এক ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হলেও তাতে কড়াকড়ির অন্ত ছিল না। সাধারণ ব্যবসা এবং কুটীরশিল্পই ছিল তাদের জীবিকার্জনের একমাত্র উপায়। শ্বেত রুশিয়া ও পশ্চিম য়ুক্রেনের নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে তাদের বসবাস করতে হত। কিন্তু সোভিয়েট আমলে তাদের সেই দুর্দশা ঘুচেছে। সোভিয়েট যুক্ত-রাষ্ট্রে সমস্ত জাতিই সমান, কাজেই ইহুদীদের জন্য সৃষ্ট সেই কৃত্রিম গণ্ডীরেখা তুলে দেওয়া হয়েছে। কেবল তাই নয়। ইহুদীরা যাতে কৃষিকাজে সুযোগ পায় তার জন্য গবর্ণমেণ্ট থেকে নানাভাবে তাদের সাহায্য করা হয়। পশ্চিম রুশিয়ায় যে-সকল ইহুদী একদিন দর্জি,

মুচির কাজ করে অতি দরিদ্রজীবন স্থাপন করত, আজ তারা সমবায় কৃষিক্ষেত্রে এক একজন সুখী কৃষক। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের হিসাবেই দেখা যায়, য়ুক্রেন এবং ক্রিমিয়ায় দুই লক্ষাধিক ইহুদী কৃষিকাজে যোগ দিয়েছে। বৃত্তি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহুদীরা তাদের স্থানও পরিবর্তন করেছে। উর্বর অথচ একরূপ অনাবাদি জমি তাদের কৃষিকাজের জন্য দেওয়া হয়েছে। পূর্বদিকে আমুরের শাখানদী বিজান ও বীরার তীরে ইহুদীদের এক নতুন উপনিবেশ গড়ে উঠেছে। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সেখানে একজন ইহুদীরও বাস ছিল কিনা সন্দেহ। প্রথম পঞ্চবার্ষিক প্রচেষ্টা শেষ হওয়ার আগেই সেখানে ৭ হাজার ইহুদী গিয়ে বসত স্থাপন করে। তারা সেখানে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকাজে লেগে যায়। তারপর সেই উপনিবেশে ধীরে ধীরে বিদ্যুতের কারখানা, কাপড়ের কল, ইমারতী মালমশলা প্রস্তুতের কারখানা, কাঠের আসবাবপত্রের কারখানা, করাতকল প্রভৃতি স্থাপিত হয়। ইহুদীদের বিদ্যালয় ও শিল্পশিক্ষালয় খোলা হয়। ক্রমশ সেখানে ইহুদী পত্রিকা বেরয় এবং ইহুদীরা তাদের থিয়েটার খোলে। দ্রুত অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির ফলে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে এই উপনিবেশকে স্বাতন্ত্র্যপ্রাপ্ত ইহুদী প্রদেশ বলে ঘোষণা করা হয়। জার্মানীতে নাৎসীরা যে ইহুদী সম্প্রদায়ের ওপর বর্বরোচিত আচরণ করেছে এবং যে ইহুদী সমস্যা নিয়ে জগতের বিভিন্ন দেশ বিব্রত, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে সেই ইহুদী সমস্যার এভাবে সুষ্ঠু সমাধান করা হয়েছে। ইহুদীদের এরূপ ভৌগোলিক সংগঠন ইতিপূর্বে জগতে আর কোথাও হয় নি।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র সহর ও গ্রামের পার্থক্য ঘুচাতে চায়। তার অর্থ এ নয় যে, সেখানে সহরগুলি সব তুলে দেওয়া হবে। গ্রাম্য

অঞ্চলে নতুন নতুন শিল্পকেন্দ্র গড়ে তুললে আপনা থেকেই সেখানে ছোট ছোট সহরের পত্তন হবে এবং তার ফলে গ্রাম্য জীবনেও সহরের শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং সভ্যতার আঁচ লাগবে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র তার এ চেষ্টায় অনেকখানি সফল হয়েছে। সেখানে বহু কৃষিজীবি শিল্পজীবি হয়ে উঠেছে এবং গ্রামগুলির রূপান্তর ঘটেছে। নতুন নতুন সহরের পত্তন হওয়ায় প্রাচীন সহর ও গ্রামে যে আকাশপাতাল পার্থক্য ছিল তা লোপ পেতে চলেছে। আগের তুলনায় সহরবাসীর সংখ্যাও দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়ই সহরবাসীর সংখ্যা শতকরা ১৮ থেকে বেড়ে ২৪শে গিয়ে দাঁড়ায়। রুশ বিপ্লবের পর সমগ্র দেশে বাসগৃহের সংখ্যা প্রায় দুই তৃতীয়াংশ বেড়ে যায়। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ছ'বছরে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পহীন সহরগুলিতে লোকসংখ্যা শতকরা মাত্র ১২ জন বাড়ে, আর শিল্পপ্রধান সহরগুলিতে বাড়ে শতকরা প্রায় ৪৫ জন। নতুন কারখানা অঞ্চলে লোক বৃদ্ধির অনুপাত আরও বেশী। নব প্রতিষ্ঠিত শিল্পকেন্দ্রগুলির উন্নতির দিকে অধিক নজর দেওয়া হয়। সেজন্য ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ থেকে প্রায় একরূপ নিয়মেই দাঁড়িয়ে যায় যে, মস্কো এবং লেনিনগ্রাডে আর কোন বড় কারখানা স্থাপিত হবে না।

কেবল শিল্প নয়, কৃষি অবলম্বন করেও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে নতুন সহর গড়ে উঠেছে। বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষের ব্যবস্থা হওয়ায় কৃষির যন্ত্রপাতি নির্মাণের জন্য সুদূর পল্লী-অঞ্চলে কারখানা স্থাপন করতে হয়েছে। কেবল কারখানা নয়, জমির উর্বরতা, বীজ ও ফসল পরীক্ষা করে দেখবার জন্য সেই সব স্থানে কৃষি-গবেষণাগারও স্থাপিত হয়েছে। সেগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ছোট ছোট সহর।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দুর্গতির মূলে যে অর্থনৈতিক কারণ

বিদ্যমান—সমাজতন্ত্রবাদী সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র স্বভাবতই এ সম্বন্ধে সচেতন এবং সেজন্যই অর্থ নৈতিক দুর্গতি দূরীকরণার্থ তার ব্যাপক শিল্প-অভিযান। এর ফলে মধ্য এশিয়া, সাইবেরিয়া, ট্রান্সককেশাস প্রভৃতি এলাকায় অতিশয় দ্রুতগতিতে ছোট বড় নানাপ্রকার শিল্প গড়ে উঠেছে এবং সমগ্র সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শিরা উপশিরায় নতুন প্রাণশক্তি সঞ্চারিত হয়েছে।

অরণ্যচারী শিকারী ও যাযাবর মেষপালকগণ আজ কারখানার সুদক্ষ শ্রমিকে পরিণত। পুঁজিবাদীদের স্বার্থরক্ষার জন্য সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রীয় বিধানের ফলে শ্রমিকগণ যেমন কেবল উৎপাদনের যন্ত্রস্বরূপ হয়ে পড়ে, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রমিকগণের সে অবস্থা দাঁড়ায় নি। উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েট জীবনযাত্রার মানও অনেকখানি উন্নত হয়েছে এবং তাদের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল হওয়ায় ক্রয়শক্তি বেড়েছে। এই ক্রয়শক্তির মান নির্ণয় করেই সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করেন। বড় বড় শিল্পগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় এবং পুঁজিবাদের অবসর না থাকায় সেখানে কেবল মুনাফার জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল উৎপাদন করা হয় না এবং কাঁচা মাল সংগ্রহ বা পাকা মাল বেচিবার জন্য সাম্রাজ্যেরও তার প্রয়োজন নেই। কাঁচা মাল বিক্রয়ের দিক দিয়ে সে যাতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে সেদিকেই তার লক্ষ্য। ব্যক্তিগত মুনাফার প্রশ্ন নেই বলেই শ্রমিকদের অতিরিক্ত পরিশ্রমের কথাও ওঠে না এবং মাঝখানে মুনাফা করার কেউ নেই জেনেই সোভিয়েট শ্রমিকরা উৎপাদন বৃদ্ধিতে অধিকতর উৎসাহী হয়। পুঁজিবাদী দেশের মত উৎপাদন ও বণ্টনের মধ্যে সেখানে কোন অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব নেই এবং এই দ্বন্দ্বহীনতার মধ্যেই সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অপরিমেয় প্রাণশক্তি নিহিত।

সোভিয়েটতন্ত্র

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র এক বিরাট দেশ। তার ক্ষেত্রফল ৮১ লক্ষ ৪৪ হাজার বর্গ মাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ১৯ কোটি (রুশ-জার্মান যুদ্ধ বাধার আগের হিসাব)। বৃটিশ সাম্রাজ্য পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ স্থান জুড়ে আছে, আর সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে আছে পৃথিবীর প্রায় এক ষষ্ঠাংশ স্থান। তার মধ্যে আবার সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের মাত্র এক পঞ্চমাংশ হল য়ুরোপে; বাকী চার পঞ্চমাংশ এশিয়ায়। মেরু সাগরের দিকে তার মত এত বড় দীর্ঘ উপকূলরেখা আর কোন দেশের নেই। সাইবেরিয়ায় রয়েছে তার বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ এবং বিস্তৃত অকর্ষিত জমি। কাষ্ঠ সম্পদের দিক দিয়ে জগতে তার স্থান সকলের শীর্ষে। দক্ষিণ অঞ্চলে রয়েছে ফল-ফলাতি, চা এবং কার্পাস চাষের প্রচুর জমি। সেখানে এক প্রকার গাছের আবাদ হয় তাতে রবার পাওয়া যায়। ককেসারের তেলের খনি তার এক অমূল্য সম্পদ এবং য়ুক্রেনের উর্বর জমিতে সোণা ফলে। তাকে বলা হয় গমের ভাণ্ডার। এ ছাড়া সুদূর প্রাচ্যে মোঙ্গোলিয়া, চীন এবং মাঞ্চুকুওর নিকটবর্তী এলাকায় সব নতুন নতুন শিল্পকেন্দ্র গড়ে উঠেছে। এমন কি কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী মরু অঞ্চলও তা থেকে বাদ পড়ে নি।

এই বিরাট দেশে কেবল রুশ জাতিই বাস করে না, আরও বহু জাতি রয়েছে। শাসনতন্ত্রে চল্লিশটি বিভিন্ন জাতির নামোল্লেখ করা হয়েছে। তাদের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র। কেবল বিশালতাই সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য নয়; বিপ্লবের ফলে সেখানে যে নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছে সেটাই আজ সত্যিকারের বিস্ময়।

সেখানে এখন কোন জমিদার নেই যে খাজনার উপর বেঁচে থাকবে বা কোন কারবারের অংশীদার বা মালিক নেই যে মুনাফার ওপর জীবন ধারণ করবে। দেশের সমস্ত জমিই সর্বসাধারণের সম্পত্তি; সমস্ত শিল্পই হয় রাষ্ট্র বা কোন গণপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত এবং সমস্ত পরিবারই শ্রমার্জিত অর্থে জীবিকানির্বাহ করতে বাধ্য। অনুপার্জিত অর্থে জীবন ধারণ করা সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে আইনত অপরাধ।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে শিল্প এবং কৃষি রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিচালিত। পরিকল্পনার প্রধান তিনটি উদ্দেশ্য: (ক) দেশরক্ষার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা; (খ) উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নতুন নতুন শিল্পকেন্দ্র ও কারখানা স্থাপন; এবং (গ) ক্রমশ সর্বসাধারণের জীবনযাত্রার মান যতদূর সম্ভব উন্নত করা।

শিল্প যেমন রাষ্ট্র কিংবা মিউনিসিপ্যালিটী কর্তৃক পরিচালিত হয়, তেমনি কৃষকগণ একত্র হয়ে জমি চাষ ও ফসল উৎপাদন করে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি সারা বছরে যেমন কাজ করে সেই অনুপাতে তাকে ফসলের অংশ দেওয়া হয়। পরিকল্পিত অর্থনীতি অবলম্বনের ফলে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে বেকার সমস্যা লোপ পায় এবং সে সমস্যা আর কোনদিন আসবে কিনা সন্দেহ। অথচ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জগতে শীর্ষস্থান লাভ করা সত্ত্বেও ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তার প্রায় এক কোটি লোক বেকার ছিল। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট তাঁর "নিউ ডিল" পরিকল্পনার দ্বারা সেই সমস্যায় অনেক জোড়াতালি দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সমস্যার মূলে যে পুঁজিতন্ত্র রয়েছে তা দূরীকরণের চেষ্টা না করায় তাঁর সমস্ত প্রয়াস একরূপ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

পরিকল্পনার দ্বারা কেবল শিল্পোৎপাদনই বৃদ্ধি পেয়েছে এমন নয়,

সোভিয়েট জনসাধারণের স্বাস্থ্য এবং শিক্ষারও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। ২৩ বছর আগে যে রুশিয়ার শতকরা ৮০ জন ছিল নিরক্ষর, আজ তার শতকরা ৮০ জন শিক্ষিত। মৃত্যুর হারও সেখানে গিয়েছে অনেক কমে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ হতে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মৃত্যুর হার হাজার করা বত্রিশ থেকে নেমেছে সতেরতে।

শাসনব্যবস্থা

আমেরিকা বলতে যেমন কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বোঝায় না, তেমনি সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র বলতেও কেবল রুশিয়াকেই বোঝায় না। যে ষোলটি সোভিয়েট রিপাব্লিক নিয়ে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র গঠিত, রুশিয়া তারই একটি রিপাব্লিক। ইংরেজীতে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রকে সংক্ষেপে বলা হয় ইউ° এস° এস° আর°—অর্থাৎ 'য়ুনিয়ন অব সোভিয়েট সোস্যালিষ্ট রিপাব্লিকস', যার বাংলা করলে দাঁড়ায় সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক রিপাব্লিকগুলির যুক্তরাষ্ট্র। আমরা সংক্ষেপে একে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রই বলব। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র নিম্নের ষোলটি রিপাব্লিক নিয়ে গঠিত :—

(১) রুশিয়া, (২) য়ুক্রেন, (৩) বাইলো-রুশিয়া (শ্বেত রুশিয়া), (৪) ক্যারেলোফিনিশ, (৫) এস্তোনিয়া, (৬) লাটভিয়া, (৭) লিথুয়ানিয়া, (৮) মলদাভিয়া, (৯) জর্জিয়া, (১০) আর্মেনিয়া, (১১) আজার বাইজান, (১২) উজ্‌বেকিস্তান, (১৩) তাজিকিস্তান, (১৪) তুর্কীস্তান, (১৫) কিরগীজ এবং (১৬) কাজাক।

এই ষোলটি রিপাব্লিকের মধ্যে রুশ রিপাব্লিকের আয়তন সর্বাপেক্ষা বেশী। প্রত্যেক রিপাব্লিকেরই নিজস্ব গবর্ণমেণ্ট আছে এবং যুক্তরাষ্ট্রে সকলেরই সমান অধিকার। এই সকল রিপাব্লিকের লোক সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের যেখানেই গিয়ে বাস করুক সকলেই সমান নাগরিক

অধিকার পাবে। এছাড়া এসব রিপাব্লিকের মধ্যে আবার ছোট ছোট জাতি নিয়ে গঠিত সব স্বায়ত্তশাসনপ্রাপ্ত রিপাব্লিক রয়েছে। সেগুলিকে বলা হয় 'অটোনমাস ন্যাশনাল রিপাব্লিক'। কেবল তাই নয়, স্থান বিশেষে সামান্য লোক নিয়ে একটি গ্রামকে পর্যন্ত স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়েছে। এমন কি সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিণের আমলে যে-সকল জার্মান গিয়ে রুশিয়ায় বসত স্থাপন করেছিল, ভল্গা নদীর তীরে তাদেব জন্য একটি স্বতন্ত্র জার্মান অটোনমাস রিপাব্লিক পর্যন্ত করে দেওয়া হয়েছে।



সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট
মঃ কালিনিন

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা রয়েছে 'সুপ্রিম সোভিয়েট'-এ, অর্থাৎ যাকে বলা যায় সোভিয়েট পার্লামেণ্ট। সুপ্রিম সোভিয়েটের প্রত্যেক সদস্য সার্বজনিক ভিত্তিতে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে নির্বাচিত হন। সুপ্রিম সোভিয়েটের দুটি পরিষদ রয়েছে। উভয় পরিষদেব সমান অধিকার। একটির নাম 'সোভিয়েট অব দি য়ুনিয়ন' এবং অপরটির নাম 'সোভিয়েট অব ন্যাশনালিটিজ'।

'সোভিয়েট অব দি য়ুনিয়ন'-এ ছ'শ'রও বেশী সদস্য রয়েছেন। প্রতি তিন লক্ষ লোকে একজন করে প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। 'সোভিয়েট অব ন্যাশনালিটিজ'ও প্রায় সমান সংখ্যক সদস্য নিয়েই

গঠিত। তাতে প্রতিনিধি নির্বাচন হয় এভাবে :—মূল রিপাব্লিকের প্রত্যেকটি হতে পঁচিশ জন করে সদস্য; প্রত্যেক অটোনমাস রিপাব্লিক থেকে এগার জন করে সদস্য এবং ছোট ছোট স্বাতন্ত্র্য প্রাপ্ত এলাকাগুলি থেকে একজন কি দুজন করে প্রতিনিধি। এভাবে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র অধিবাসী যেমন স্থপ্রিম সোভিয়েটে প্রতিনিধিত্বের স্থযোগ পায়, তেমনি বিভিন্ন জাতিরও সেখানে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা রয়েছে।

স্থপ্রিম সোভিয়েটের যখন অধিবেশন বন্ধ থাকে তখন কাজ চালাবার জন্য একটি 'প্রিজাইডিং কমিটী' গঠিত হয়। তাকে বলে 'প্রেসিডিয়াম'। এছাড়া স্থপ্রিম সোভিয়েট কর্তৃক একটি মন্ত্রিসভাও নিযুক্ত হয়। সোভিয়েট মন্ত্রিসভার নাম 'কাউন্সিল অব পিপল্‌স্ কমিসার্স'। রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান দপ্তরগুলি এক একজন কমিসার বা মন্ত্রীর হাতে থাকে। 'কাউন্সিল অব পিপল্‌স্ কমিসার্স'এর চেয়ার-ম্যানই হলেন প্রধান মন্ত্রী। বর্তমানে মঃ ষ্ট্যালিন এই পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

রুশ-জার্মান যুদ্ধের ফলে যেমন জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হয় তেমনি প্রেসিডিয়ামও জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন করে। দেশরক্ষার যাবতীয় কার্য-নির্বাহের জন্য নিম্নের পাঁচ জন নিয়ে এক কাউন্সিল বা পরিষদ গঠিত হয় :

মঃ ষ্ট্যালিন (প্রধান মন্ত্রী), মঃ মলোটফ (পররাষ্ট্র সচিব), মঃ ভরোশিলফ (উত্তর রণাঙ্গণের প্রধান সেনাপতি), মঃ বেরিয়া (স্বরাষ্ট্র সচিব) এবং মঃ ম্যালেঙ্কফ (সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের কম্যুনিষ্ট পার্টির একজন সেক্রেটারী)।

কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের মত অপরাপর প্রধান রিপাব্লিকগুলির

প্রত্যেকটিতে একটি করে সুপ্রিম সোভিয়েট রয়েছে। সেখানেও সার্বজনিক ভিত্তিতে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে সদস্য নির্বাচন হয়। তবে সেই সব সুপ্রিম সোভিয়েটে মাত্র একটি করে পরিষদ। এছাড়া ক্ষুদ্র জাতিগত স্বাতন্ত্র্যপ্রাপ্ত এলাকা এবং প্রত্যেক সহর ও গ্রামের জন্যও সব ছোট ছোট সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ রয়েছে। সেই সব স্থানেও স্থানীয় জনসাধারণ কর্তৃক সার্বজনিক ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচন হয়।

সোভিয়েটকে বাংলায় আমরা পঞ্চায়েৎ বলতে পারি। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে স্থানীয় সোভিয়েটগুলির ক্ষমতা যথেষ্ট। স্ব স্ব এলাকায় শিক্ষাবিস্তার এবং স্বাস্থ্যরক্ষার দায়িত্ব তো সেগুলির ওপর ন্যস্ত রয়েছেই, তাছাড়া বহু ক্ষেত্রে সমবায় ভাণ্ডার চালান, কারখানা স্থাপন এবং আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থাও সেগুলির করতে হয়। ঊর্ধতন সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের নির্দেশ তাদের মেনে চলতে হয় এবং সর্বদা লক্ষ্য রাখতে হয় যে, তাদের স্থানীয় কাজ যেন কোন ভাবে রাষ্ট্রের বৃহত্তর পরিকল্পনাবিরুদ্ধ না হয়।

একজন সাধারণ সোভিয়েট নাগরিকের এতগুলি ভোটাধিকার রয়েছেঃ—কেন্দ্রীয় সুপ্রিম সোভিয়েটের দুই পরিষদে প্রতিনিধি নির্বাচন; তার নিজস্ব রিপাব্লিকের সুপ্রিম সোভিয়েটে প্রতিনিধি নির্বাচন এবং তার স্থানীয় সোভিয়েটে প্রতিনিধি নির্বাচন। নিজের নির্বাচকমণ্ডলীতে এক বা একাধিক শ্রমিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মনোনীত হলেই যে কেউ নির্বাচনে দাঁড়াতে পারে। জনসাধারণেরই নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ কর্তৃক গঠিত সুপ্রিম সোভিয়েট 'কাউন্সিল অব পিপল্‌স্ কমিসার্স' বা মন্ত্রিসভা নিযুক্ত করে থাকে। সেই মন্ত্রিসভা কর্তৃক দেশরক্ষা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বৃহৎ শিল্প, সমর শিল্প, কাষ্ঠ ব্যবসায়, কৃষি এবং দেশের সমস্ত অর্থনৈতিক জীবন পরিচালিত হয়।

প্রথমেই বলেছি, প্রত্যেক সক্ষম নাগরিকই জীবিকার্জনের জন্য শ্রম করতে বাধ্য। রাষ্ট্র পরিচালিত কোন কারখানায় কাজ নিলে তার নিয়োগকর্তা হয় ষ্টেট ট্রাষ্ট। উক্ত কারখানা যে শিল্পের অন্তর্গত সেই শিল্প বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর দপ্তর কর্তৃক ওই ষ্টেট ট্রাষ্ট নিয়ন্ত্রিত হয়। তারপর মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালিত কোন কারখানা, রেস্তোরাঁ বা দোকানে কেউ কাজ নিলে তার নিয়োগকর্তা হয় স্থানীয় সোভিয়েট। কোন সমবায় খামারে কেউ কাজ করলে তাকে অন্যান্য গ্রামবাসীর সঙ্গে একত্রে চাষবাস করতে হয় এবং আর সবার মত সেও উক্ত খামারের একজন অংশীদাররূপে ফসলের ভাগ পায়।

কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকগণ সোভিয়েটগুলিতে তো প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারেই, তা ছাড়া ট্রেড য়ুনিয়নে অর্থাৎ শ্রমিক সঙ্ঘে যোগ দিয়ে তারা ট্রেড য়ুনিয়ন কমিটীতে তাদের প্রতিনিধিও নির্বাচন করতে পারে। সমবায় খামারে কৃষকরা তাদের পরিচালনা-কমিটীর সদস্য নির্বাচনে যোগ দেওয়ার অধিকারী।

এ ছাড়া সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রায় ২৫ লক্ষ সভ্য রয়েছে। তারা বিভিন্ন শাখা কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য নির্বাচনে যোগ দিয়ে থাকে।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণে কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রাধান্য বিদ্যমান। সেখানে আর কোন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব নেই। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবের পর সেখানে যে-সব দল মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল তারা ছিল কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূ। যে-সব দল সোভিয়েট তন্ত্রের অবসান ঘটাবার জন্য অস্ত্রধারণ করেছিল বা বিদ্রোহের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল তাদের কঠোর হস্তে দমন করা হয়। কম্যুনিষ্ট পার্টি, তার নীতি এবং কম্যুনিষ্ট নেতৃবৃন্দ যে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে কতখানি জনপ্রিয়,

রণাঙ্গনে লালফৌজের নৈতিক দৃঢ়তাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কম্যুনিষ্ট পার্টি জনপ্রিয় না হলে সোভিয়েট যুদ্ধ সত্যিকারের জনযুদ্ধ হয়ে উঠত না এবং জার্মান-অধিকৃত সোভিয়েট এলাকায়ও জনসাধারণ সমস্ত বিপদ তুচ্ছ করে গেরিলা যুদ্ধকৌশল অবলম্বন করত না।

নির্বাচনপ্রথা

আঠার বছর বয়স হলেই যে কেউ নির্বাচনে ভোট দিতে পারে। স্ত্রী পুরুষে কোন প্রভেদ নেই। সাধারণ নাগরিকদের মত সাধারণ সৈন্যরাও ভোট দেবার অধিকারী। কম্যুনিষ্ট পার্টির ন্যায় ট্রেড য়ুনিয়ন, কো-অপারেটিভ সোসাইটি, বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান এবং যুব প্রতিষ্ঠানগুলিও নির্বাচনে প্রার্থী মনোনীত করতে পারে। এছাড়া শ্রমিকগণ এবং কৃষকরা সাধারণ সভা করেও তাতে প্রার্থী মনোনীত করার অধিকারী। নির্বাচন প্রার্থীকে যে কম্যুনিষ্ট পার্টির সভ্য হতেই হবে এমন কোন কথা নেই।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে যে নতুন শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হয় তদনুসারে এপর্যন্ত মাত্র একবারই সাধারণ নির্বাচন হয়েছে। সেই নির্বাচনে প্রত্যেক নির্বাচকমণ্ডলীতে একটি করে সম্মেলন হয়। যে-সব প্রতিষ্ঠান থেকে প্রার্থী মনোনীত করা হয় সেই সব প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা উক্ত সম্মেলনে যোগ দেয়। সেই সব সম্মেলনে স্থির হয় যে, সকলে একমত হয়ে কোনও একজন বিশিষ্ট প্রার্থীকে সমর্থন করবে। তার ফলে প্রত্যেক নির্বাচকমণ্ডলীতেই এক একজন প্রার্থীকে সর্বাগ্রে স্থান দেওয়া হয় এবং তাঁরা তাঁদের স্ব স্ব নির্বাচকমণ্ডলীতে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের সমর্থন লাভ করেন। প্রার্থীর সামাজিক, ব্যক্তিগত এবং কর্মজীবন আদর্শস্থানীয় কিনা, মনোনয়নকালে সে সম্বন্ধে

বিশেষ ভাবে বিবেচনা করা হয়। আইন সভায় যাঁকে পাঠিয়ে নির্বাচকগণ বিশ্বাস করতে পারে যে, তাঁকে দিয়ে তাদের স্বার্থ যথাযথ রক্ষিত হবে কেবল তাঁকেই তারা মনোনীত ও নির্বাচিত করে। পুঁজিবাদী তথাকথিত গণতান্ত্রিক দেশগুলিব সঙ্গে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে পার্থক্য রয়েছে। পুঁজিবাদী দেশগুলিতে অর্থ দিয়ে ও নানারূপ প্রলোভন দেখিয়ে বিত্তশালী লোকেরা যেভাবে ভোট-দাতাদের হাত করে, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে প্রার্থীদের সেভাবে টাকা ছড়াবার উপায় নেই। সেখানে প্রার্থীদের নৈতিক বলে জনসাধারণের আস্থা অর্জন কবতে হয় এবং সেজন্যই তাঁরা হন সত্যিকারের গণ-প্রতিনিধি। পক্ষান্তরে পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক দেশ-গুলিতে জনসাধারণের অধিকার স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও দেখা যায়, নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে যাঁরা নির্বাচনে জয়লাভ করেন তাঁদের অধিকাংশই কায়েমী স্বার্থের সংরক্ষক। বিত্তশালীরা হয় নিজেরাই নির্বাচনে অবতীর্ণ হন, আর তা না হলে অর্থানুকূল্যে এমন সব লোক নির্বাচনে দাঁড় করান যাঁরা আইন সভায় গিয়ে তাঁদের ধনী মুরুব্বীদেবই স্বার্থরক্ষার জন্য লডবেন। এই গলদ রয়েছে বলেই তথাকথিত গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে নানারূপ বিসদৃশ অবস্থার সৃষ্টি হয়।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রেব নির্বাচনে কে কাকে ভোট দিল জানবার উপায় নেই। কেবল ভোট গণনার সময় জানা যায় কোন্ প্রার্থী কত ভোট পেলেন। স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে ভোটদাতারা নিজে এসে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে একখানি সীলমোহর করা খামে ভোট দিয়ে যাবে। সুপ্রিম সোভিয়েট কিংবা স্থানীয় সোভিয়েটসমূহের নির্বাচিত সকল সদস্যকেই মাঝে মাঝে তাঁদের নির্বাচকমণ্ডলীতে এসে কাজের বিবরণ দিয়ে যেতে হয়। কাহারো কাজ সন্তোষজনক না হলে নির্বাচকরা

তাঁকে সরিয়ে অবিলম্বে আর একজনকে সেই পদে নির্বাচিত করে.; পরবর্তী নির্বাচনের অপেক্ষায় তাদের বসে থাকতে হয় না।

আমাদের দেশের ম্যাজিষ্ট্রেট-কোর্টের মত সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে যে সব কোর্ট আছে সেগুলিকে সেখানে বলা হয় 'পিপল্‌স্ কোর্ট'। পিপল্‌স্ কোর্টের জজরাও সর্বসাধারণের ভোটে নির্বাচিত হন।

শিশুকল্যাণ

কথায় বলে, কোন গবর্ণমেণ্টের রাজনৈতিক কাঠামো দিয়ে তার বিচার করা করা চলে না। বাস্তবিক পক্ষে বিচার্য বিষয় হল কোন্ গবর্ণমেণ্ট গণকল্যাণের জন্য কতটুকু কি করে। শিশুই জাতির ভবিষ্যৎ। অতএব সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের গণকল্যাণ প্রচেষ্টা সম্বন্ধে কিছু বলতে হলে সর্বাগ্রে বলা দরকার সেখানে শিশুদের জন্য কি কর: হয়।

সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ আগাগোড়াই শিশুকল্যাণের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে এসেছেন। এমন কি গত মহাযুদ্ধের পর রুশিয়ায় যখন ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তখনও সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ শিশুমঙ্গলকেই রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায় সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন। সোভিয়েট শাসন প্রতিষ্ঠার পর প্রথম যে-সকল আইন পাশ হয় তার মধ্যে সর্বসাধারণ্যে শিক্ষা বিস্তারের একটি আইন থাকে। আইন পাশ হয়ে কেবল সরকারী দপ্তরখানার খাতাপত্রেই তা সীমাবদ্ধ রয় নি; তা কাজে লাগাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে। তারই ফলে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে যেখানে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ছিল ৮০ লক্ষ; সেখানে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা এসে দাঁড়ায় ৩ কোটি ২০ লক্ষে।

আমাদের দেশে যেমন সাধারণত বালকবালিকাদের বিদ্যালয়ে পাঠিয়েই খালাস, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে ঠিক তেমন নয়। বিদ্যালয়ে

পাঠাবার আগেও শিশুদের জন্য যথেষ্ট যত্ন নেওয়া হয়। কার্যত প্রত্যেক শিশুর জন্মের আগে থেকেই তার মঙ্গলের জন্য নানাবিধ সরকারী ব্যবস্থা রয়েছে। সন্তানসম্ভবা হলেই প্রত্যেক নারী বিনা পয়সায় ডাক্তারী সাহায্য পেয়ে থাকে। প্রত্যেক সহরে এবং এখন বহু গ্রামেও প্রসূতিভবন স্থাপিত হয়েছে। সেখানে বিনা খরচায় সন্তান প্রসব হয়। এছাড়া যে-সব নারী জীবিকার্জনের জন্য কাজ করে, সন্তান প্রসবের পর তাদের পূর্ণ বেতনে দু'মাসের ছুটি দেওয়া হয়। তারপরও কয়েক মাস তাদের খুব বেশী পরিশ্রমের কাজে দেওয়া হয় না। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী যার জন্য যতদিন যেমন হালকা কাজের দরকার ততদিন তাকে তেমন হালকা কাজেই রাখা হয় এবং সেই সময়টায়ও তারা পুরা বেতনই পায়। তদুপরি শিশুর জন্মের পর তার জন্য কিছুদিন ভাতা বাবদ কিছু অর্থ দেওয়া হয়। এছাড়া কারো সাতটির বেশী সন্তান হলেই সে মোটা রকমের একটা ভাতা পেয়ে থাকে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে মাতৃত্ব অবজ্ঞাত না হয়ে এভাবে পুরস্কৃত হয়।

রাষ্ট্রের লক্ষ্য শিশুদের যাতে উপযুক্ত যত্ন হয় অথচ সন্তান লালন-পালন নিয়ে মাবাপ খুব বেশী ব্যাপৃত না হয়ে পড়ে। সেজন্য যে-সব নারী শ্রমজীবী, তাদের শিশুদের জন্য রয়েছে শিশুমঙ্গলালয় এবং কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয়। সেখানে সব শিক্ষিতা নার্স তাদের তত্ত্বাবধান করে এবং সেই শিশুসমাজে হয় শিশুমনের সহজ বিকাশ। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যরক্ষার প্রাথমিক নিয়ম পালনে তারা সেখানে আপনা থেকেই অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

শিশুমঙ্গলালয় এবং কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয়গুলি অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয় এবং প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানই তার নারী শ্রমিকদের সন্তানসন্ততির জন্য এ ব্যবস্থা করতে বাধ্য একথা সত্য; কিন্তু তা বলে

পরিবার থেকে শিশুদের একেবারে বিচ্ছিন্ন করে রাখাই সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য নয়। বরঞ্চ এটাই তাদের কাম্য যাতে দিনে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অন্তত বার ঘণ্টাকাল শিশুরা বাড়ীতে তাদের মাবাপ ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের মধ্যেই থাকে।

শৈশব পার হলেই ছেলেমেয়েদের জন্য সব সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। কেবল স্কুলকলেজের শিক্ষাই সেখানে যথেষ্ট



কিণ্ডারগার্টেনে সোভিয়েট শিশু

বলে বিবেচিত হয় না, বাইরেও তাদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানে ছেলেমেয়েরা যে যার রুচি অনুযায়ী শিক্ষার সুযোগ পায়। বড় বড় সহরের উদ্যানগুলিতে লাইব্রেরী, খেলাধূলা এবং অন্যান্য সব শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। ছেলেমেয়েদের যার যেদিকে

বেশী ঝোঁক সেখানে সে তা শিখবার সুযোগ পায়। সেখানে সরকারী বেতনে শিক্ষক নিযুক্ত রয়েছেন। এছাড়া সোভিয়েট যুক্ত-রাষ্ট্রের প্রায় প্রতি নগরে এবং বহু গ্রামেও শিশুশিক্ষার জন্য সব "পায়োনিয়ার প্যালেস" বা শিশু-যাদুঘর স্থাপিত হয়েছে। এঞ্জি-নিয়ারিং, প্রাকৃত বিজ্ঞান, বিমান ও রেলওয়ের খেলনা, নৃত্য, গীত, চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য, ফটোচিত্র, খেলাধূলা প্রভৃতির নিদর্শন এবং তৎসম্পর্কে এমন সব যন্ত্রপাতি রয়েছে যেগুলি দেখে শিশুমন সহজেই আকৃষ্ট হয়। সেই সব দেখে যে শিশু যেমন শিখতে চায় তাকে তেমন যন্ত্রপাতি দিয়ে শিক্ষকরা সাহায্য করে থাকেন। সব শিশুই সেখানে ভর্তি হতে পারে না। বিদ্যালয়ে যারা খুব ভাল ফল দেখায় তারাই সাধারণত সেখানে প্রবেশের অধিকার পায়। তাছাড়া কোন শিশুর মধ্যে নতুন কিছু সৃষ্টির জন্য অদম্য স্পৃহা দেখা গেলে তাকে পায়োনিয়ার প্যালেসে পাঠান হয়। বিস্ময়ের কথা এই যে, এই সব শিক্ষালয়ে ছেলেমেয়েরা এঞ্জিনিয়ারিং, বিমানবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, কৃষিবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে এমন সব নতুন জিনিসের সন্ধান দিয়েছে যেগুলি দেশের অর্থনৈতিক জীবনে গ্রহণযোগ্য। শিশু মনে নতুন আবিষ্কারের যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থাকে, এই সব বিদ্যালয়ে এসে তাদের সেই প্রবৃত্তির সহজ বিকাশ হয়।

কতগুলি সহরের ময়দানে ছেলেদের জন্য রেলওয়ের মডেল পাতা হয়েছে। কি করে রেলওয়ে চালাতে হয় এবং কোন্ যন্ত্রপাতি কি কাজে লাগে, ছেলেরা তা সব সেখানে শিখে। তারাই সেগুলি চালায় এবং কিছু ভেঙ্গে গেলে তারাই তা মেরামত করে। এছাড়া লেনিনগ্রাড ও ওডেসায় ছেলেদের জন্য নকল বন্দর তৈরী করা হয়েছিল। তাতে সব ছোট ছোট জাহাজ থাকত এবং সেই সব

মডেল জাহাজের সাহায্যে ছেলেরা জাহাজচালনা, জাহাজপ্রস্তুত ও মেরামতী কাজ শিখত। এগুলি তারা নিজেরাই চালাত এবং তা নিয়ে ছেলেরা দস্তুরমত মাথা খাটাত।

তারপর সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে শিশুদের নিজস্ব থিয়েটার রয়েছে। শিশু থিয়েটারের সংখ্যা শত খানেকের কম হবে না। শিশুদের বোধ্য করে সব নাটক লেখা হয় এবং শিশুরাই তার অভিনয় করে। তাছাড়া সেখানে কেবল শিশুদেরই জন্য বহু সিনেমা রয়েছে এবং সেই সব সিনেমায় শিশুশিক্ষার উপযোগী সব ছবি দেখান হয়। এতদ্ব্যতীত শিশুরা যাতে গ্রীষ্মাবকাশ বেশ আমোদপ্রমোদের ভিতর দিয়ে কাটাতে পারে তার জন্য রাষ্ট্রপরিচালিত কারখানা, স্কুল ও ট্রেড য়ুনিয়নসমূহের কর্তৃপক্ষগণ সব 'সামার ক্যাম্প' বা গরমের ছুটি কাটাবার শিবির স্থাপন করেছেন। সেই সব শিবিরে নার্স, ডাক্তার ও শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে ছেলেমেয়েরা পরম আনন্দে গরমের ছুটিটা কাটিয়ে দেয়। এভাবে প্রায় বিশ লক্ষ ছেলেমেয়ের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। বলা বাহুল্য, যুদ্ধের সময় এই সামার ক্যাম্পগুলি সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের খুবই উপকারে এসেছে। সহর ছেড়ে শিশুরা এই সব ক্যাম্পে গিয়ে আশ্রয় পেয়েছে এবং আগে থেকে ব্যবস্থা থাকায় তাদের শিক্ষারও কোন ব্যাঘাত হচ্ছে না।

শিক্ষাপ্রণালী

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষাব্যবস্থা শিশুবিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত এক সূত্রে গাথা। যে-সকল নারী জীবিকার্জনের জন্য কাজ করে তাদের শিশুদের জন্য রয়েছে শিশুমঙ্গলালয় এবং কিণ্ডারগার্টেন। তাছাড়া সর্বসাধারণের শিক্ষার জন্য সব প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ছেলেমেয়েরা যাবে মাধ্যমিক

বিদ্যালয়সমূহে এবং সেখান থেকে যাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার বয়স আট হতে আঠার। এই দশ বছরে তাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করতে হয় এবং তের চৌদ্দ বছর বয়স হলেই আর এক বিদ্যালয় ছেড়ে অন্য বিদ্যালয়ে যাওয়া চলে না। ছেলেমেয়েরা একই বিদ্যালয়ে পড়ে এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে শিক্ষকতার কাজে লোক নিয়োগ করা হয়। যোগ্যতাই একমাত্র মাপকাঠি, স্ত্রী-পুরুষে কোন বৈষম্য করা হয় না। ছেলেমেয়েরা যে কেবল বিদ্যালয়ে এক সঙ্গে পড়েই এমন নয়, তারা এক হোষ্টেলেও থাকে। ইংরেজ অধ্যাপক প্যাট স্লোয়ান অনেকদিন সোভিয়েট রুশিয়ায় থেকে শিক্ষকতা করেছেন। তিনি তাঁর "Russia without Illusions" পুস্তকের এক স্থানে লিখেছেন, "সোভিয়েট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকশিক্ষয়িত্রীদের মধ্যে সত্যিকারের সমভাব দেখে আমি অভিভূত হই।.........শিক্ষালয়ে নারী ও পুরুষকে আলাদা করে রাখা হয় নি। এক হোষ্টেলে, একই তলায় ছাত্রছাত্রী ভিন্ন ঘরে বাস করে, কিন্তু তাদের মধ্যে কোন অশোভন মেলা-মেশা বা অন্তরঙ্গতা আমার চক্ষে কখনও পড়ে নি; এমন কি কোন নীতিবাগীশও বোধ হয় তাদের সম্বন্ধে কোন খারাপ ধারণা করতে পারবেন না।"

কেবল স্ত্রী ও পুরুষ সম্বন্ধেই যে সমভাব বিদ্যমান এমন নয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিভিন্ন জাতিও সমান ব্যবহার পেয়ে থাকে। অথচ জারের আমলে কি জাতিবৈষম্যই না রুশিয়ায় ছিল। অধ্যাপক প্যাট স্লোয়ান তাঁর পূর্বোক্ত বইএ এ সম্বন্ধে একটি যে উদাহরণ দিয়েছেন তা মর্মান্তিক। তিনি বলেছেন:—

"একটি ইহুদী শিক্ষয়িত্রীর সহিত আমার জানাশুনা হয়। আমরা

উভয়ে উভয়ের কাছে পাঠ নিতাম। বলশেভিক বিপ্লবের আগে তিনি সেণ্ট পিটার্সবুর্গে (বর্তমান লেলিনগ্রাড) কি কষ্টে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী লাভ করেন তা তিনি আমাকে বলেন। ইহুদী বলে তিনি ছাত্রী রূপে প্রথমে রাজধানীতে থাকার অনুমতি পেলেন না। তখন তাঁকে ভিন্ন পথ বেছে নিতে হল। পুলিশের কাছে বারবনিতা বলে নাম লিখিয়ে তিনি রাজধানীতে থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের অনুমতি পেলেন। আর আজ সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে জাতি হিসাবে কাউকে ঘৃণা বা অপমান করা আইনত দণ্ডনীয়।"

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ হলে এবং 'সন্তোষজনক' এই সার্টিফিকেট পেলে সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে। 'ভালো' এবং 'উত্তম' এই সার্টিফিকেট পেলে ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ পায় এবং প্রয়োজন হলে তাদের অন্যান্য খরচ চালাবার জন্য জলপানিও দেওয়া হয়।

সাধারণ বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও শিক্ষার জন্য সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে স্বতন্ত্রভাবে বহু শিল্পশিক্ষালয় ও কৃষিবিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। সেখানে লক্ষ লক্ষ বালকবালিকা শিক্ষা লাভ করে। সেই সব বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষা তো আছেই, তা ছাড়া বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থাও রয়েছে। বৃত্তিশিক্ষার উদ্দেশ্য হল এই যে, আঠার বছর বয়সেই যেন তারা এক একজন সুদক্ষ শ্রমিক হয়ে বেরুতে পারে।

এ গেল সাধারণভাবে ছাত্রজীবনে শিক্ষার কথা। এ ছাড়া সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে বয়স্কদের শিক্ষার জন্য নানারূপ ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমাদের দেশে যেমন সাধারণত বিদ্যালয় কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়েই শিক্ষা সমাপ্ত হয় এবং কর্মজীবনে প্রবেশ করে আর অন্য কিছু শিখবার বিশেষ

প্রয়োজন আছে বলে কেউ মনে করে না, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে কিন্তু ঠিক তা নয়। সেখানে কর্মজীবনে প্রবেশ করেও অধিকাংশ লোকই অবসর সময়ে অন্য কিছু শিখে। অবশ্য এসব শিখতে তাদের কোন খরচ লাগে না, সরকারী অথবা ট্রেড য়ুনিয়নের খরচে শিখাবার ব্যবস্থা করা হয়। কারখানার শ্রমিকগণ যাতে অধিকতর সুদক্ষ কারিগর হতে পারে তার জন্য অবৈতনিক ট্রেনিং ক্লাস রয়েছে। ইচ্ছা করলেই সেখানে



সোভিয়েট বালক মডেল দেখে বিমান নির্মাণ শিখছে

গিয়ে অবসর সময়ে যে কোন শ্রমিক নিজের উন্নতির জন্য শিক্ষা লাভ করতে পারে। এছাড়া সুদূর পল্লীতে যে-সব শিক্ষক ও চিকিৎসক থাকেন তাঁরা মাঝে মাঝে সহরে এসে বিনা বেতনে নতুন নতুন বিষয়ে শিক্ষালাভ করে যান। তা ছাড়া নিজের বৃত্তি বাদে সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়ে শিখবার ব্যবস্থাও রয়েছে। অধ্যাপক প্যাট স্লোয়ান তাঁর "Russia

in Peace and in War" নামক পুস্তকের এক স্থানে লিখেছেন :—

"সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে একবার ট্রেনে দীর্ঘপথ ভ্রমণের সময় একজন রেলওয়ের খানসামা এসে আপশোষ করে আমাকে বলল যে, এত দূরপথে ভ্রমণের ফলে সে আর সন্ধ্যাবেলা অভিনয় শিখবার জন্য তার ক্লাসে যোগ দিতে পারছে না। তার নিশ্চয় বিশ্বাস, খানসামাগিরি ছেড়ে একদিন সে ভাল অভিনেতা হতে পারবে।"

কেবল বেশী রোজগারের আশায়ই যে সেখানে লোক অবসর সময়ে শিক্ষা লাভ করে এমন নয় ;—সাধারণ জ্ঞান লাভের জন্যও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রবাসীরা রাজনীতি,অর্থনীতি এবং দর্শনের ক্লাসগুলিতে যোগ দেয়।

সোভিয়েট শিক্ষা ধারার একটা মস্ত বড় বৈশিষ্ট্য এই যে, কোন সম্প্রদায় বা জাতি শ্রেষ্ঠ—এ ভাবটা মোটেই শিখান হয় না। ছোটবেলা থেকেই তারা শিখে সকল জাতি, সকল সম্প্রদায়ই সমান। তা ছাড়া শিক্ষার মধ্য দিয়ে তাদের এ বোধ জন্মে যে, দেশের জমি ও শিল্পসম্পদ কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, তাতে সকলেরই অধিকার আছে। পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্যভাব এবং কর্মস্পৃহা জাগাবার জন্যও সর্বতোভাবে চেষ্টা করা হয়। একজনের শ্রমে আর একজনের মুনাফা করা যে অন্যায়, শিক্ষার মধ্য দিয়ে এটাও তাদের বোঝান হয়। এছাড়া শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে ধর্মের কোনই সংস্রব নেই।

পারিবারিক জীবন

সোভিয়েট পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে কুচক্রীদের কুৎসিত প্রচার-কার্যের ফলে অদ্যাবধি অনেকের মনে ভ্রান্ত ধারণা না রয়েছে এমন নয়। সোভিয়েটবিদ্বেষীরা লোকের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে নিরঙ্কুশ ভাবে

এই প্রচারকার্য চালিয়েছেন। রুশ-জার্মান যুদ্ধ বাধার পর লোকের মনে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে আগ্রহ বেড়েছে এবং এতকাল যাঁরা সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে কেবল মিথ্যা বলে এসেছেন তাঁদের মুখ দিয়েও কিয়ৎপরিমাণে সত্য কথা বেরিয়েছে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র নরকের রাজ্য এবং সেখানে কেবল দুর্নীতিরই প্রশ্রয়—এই রকম প্রচারকার্যের পথ অনেকটা রুদ্ধ হয়েছে।

অনেকের বিশ্বাস, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে পারিবারিক জীবন বিনষ্ট হয়েছে। আমরা যে পারিবারিক জীবনে অভ্যস্ত সেই মানদণ্ডে বিচার করলে অবশ্য সোভিয়েট পরিবারগুলির সত্য উপলব্ধি করা সত্যই কঠিন; কিন্তু সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও সহানুভূতি সহকারে বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করলে দেখা যায়, সোভিয়েট পরিবারগুলি আনন্দোৎফুল্ল হয়ে নবরূপ পরিগ্রহ করেছে মাত্র, পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন হয় নি। নারীর জীবনে অর্থনৈতিক মুক্তি আসায় পারিবারিক বন্ধন সেখানে শক্ত হয়েছে, পড়েছে; নরনারীর অবাধ মেলামেশা সম্পূর্ণ হওয়ার অবকাশ পাওয়ায় প্রকৃতি এবং অধিকারের সমতার ভিত্তিতে নতুন জীবন গড়ে উঠেছে। মানুষের জীবনধারা যেখানে যত খাঁটি সেখানে দুর্নীতির প্রশ্রয় তত কম। মিথ্যাশ্রয়ী জীবনধারায় অনুরূপ বিশৃঙ্খলা বেশী। মানবজীবনের সব বিকারের মূলেই এই সমাজের সঙ্কট হচ্ছে মূল এবং বাইরের জীবনের পুনর্বিন্যাসের পথে প্রধান অন্তরায় অর্থনৈতিক পরাধীনতা। সোভিয়েট রাষ্ট্রব্যবস্থায় এই নারীর অর্থনৈতিক পরাধীনতা বিলোপেরই চেষ্টা করা হয়েছে এবং তার ফলে সোভিয়েট পরিবারগুলি নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেছে।

পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে প্রথমেই সোভিয়েট নারীসমাজের কথা বলতে হয়। বিবাহিত, অবিবাহিত, প্রত্যেক নারীকেই সোভিয়েট

যুক্তরাষ্ট্রে জীবিকার্জনের জন্য উৎসাহিত করা হয়। পুরুষের সমান পারিশ্রমিক নারী পায় এবং যোগ্যতা অনুসারে পদোন্নতি হয়। আগেই বলা হয়েছে, পদোন্নতি ব্যাপারে পুরুষ ও নারীতে কোন বৈষম্য নেই। এর ফলে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অসংখ্য নারী এখন স্বাধীন ভাবে জীবিকার্জন করে। সন্তান লালনপালন এবং সংসারিক কাজকর্ম যাতে জীবিকার্জনের পথে অন্তরায় হয়ে না দাঁড়ায় তদুদ্দেশ্যে শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষার জন্য রয়েছে সরকারী শিশুমঙ্গলালয় এবং কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয়সমূহ। এছাড়া প্রত্যেক অফিস বা কারখানা সংলগ্ন ভোজনালয় থাকায় রান্নাবান্নার জন্যও মেয়েদের বাড়ীতে বসে থাকতে হয় না; অবশ্য স্বামীর উপার্জনের ওপর নির্ভর করেই কেউ যদি সংসারযাত্রা নির্বাহ করতে চায় তাতেও কোন আপত্তি নেই। কিন্তু অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য কোন নারী আগ্রহান্বিত হলে তার জন্য সেই পথ সর্বদাই উন্মুক্ত। পারিবারিক জীবনের স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে এই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা যে কত দরকার, সমাজ সম্বন্ধে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই তা উপলব্ধি করবেন। বহুক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক পরাধীনতার দরুণ নারীসমাজকে পুরুষসমাজের কাছে নিগৃহীত হতে হয় এবং অর্থনৈতিক কারণে দাম্পত্য জীবন বিকৃত হয়ে ওঠে। আর্থিক প্রয়োজনে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে নারীর আর এখন স্বামী খুঁজতে হয় না বা সেই ভয়ে স্বামীর আশ্রয়ে থাকার বাধ্যবাধকতাও নেই। নরনারীর পারস্পরিক ভালবাসার ওপরই এখন সেখানে দাম্পত্য জীবন প্রতিষ্ঠিত। বলা বাহুল্য, এই অর্থনৈতিক মুক্তির ফলে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে পতিতাবৃত্তির অবসান ঘটেছে। সন্তানসন্ততির কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখেই প্রধানত সোভিয়েট বিবাহবিধি প্রবর্তিত হয়েছে। বিবাহবিচ্ছেদের পদ্ধতি সেখানে অপেক্ষাকৃত সহজ; এক পক্ষের উপস্থিতিতে অপর পক্ষ

দরখাস্ত করলেই বিবাহবিচ্ছেদ মঞ্জুর করা হয়। পথ সহজ বলেই



গৃহকর্মে রত সোভিয়েট মজুর গৃহিণী

যে সেখানে কথায় কথায় বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে থাকে এমন নয়। জীবন

ধারা সহজ হওয়ায় মানুষের দাম্পত্য জীবনের সমস্যাও অনেক কমে গিয়েছে এবং তা ছাড়া কতকগুলি আর্থিক ও নৈতিক দায়িত্ব থাকায় পারতপক্ষে কেউ বিবাহবিচ্ছেদ করতে যায় না। বিবাহবিচ্ছেদ কমাবার জন্য প্রত্যেকবার বিবাহবিচ্ছেদের ওপর ক্রমবৃদ্ধিহারে সরকারী ফী ধার্য আছে: প্রথম বারের বিচ্ছেদে ৫০ রুবল (রুশ মুদ্রা। ১ রুবল আমাদের দেশের প্রায় তিন টাকার সমান), দ্বিতীয় বারে ১৫০ রুবল এবং তৃতীয় বারে ৩০০ রুবল—এই হারে ফী আদায় করা হয়। এছাড়া বিবাহবিচ্ছেদের পর সন্তানের ভরণপোষণের খরচ বহন করতে পিতা বাধ্য। এই সব কারণে স্বভাবতই বিবাহবিচ্ছেদ কম হয়। তবে স্বামী-স্ত্রীতে নিতান্ত মনের অমিল হলে জোর করে তাদের বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ রাখার ব্যবস্থাও সেখানে নেই।

শিশুকল্যাণই সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের সর্বপ্রধান লক্ষ্য। কাজেই প্রত্যেক শিশুই যাতে জীবনের প্রারম্ভে সমান সুযোগ লাভ করতে পারে তজ্জন্য সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ বিশেষ নজর দিয়ে থাকেন। এজন্য সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে কোন সন্তানকেই অবৈধ বলে বিবেচনা করা হয় না। বিয়ের আগে সন্তান জন্মালেও পিতাকে জনকত্ব স্বীকার করতেই হবে এবং সেই সন্তানের ভরণপোষণের জন্য তার আয়ের এক চতুর্থাংশ দিতে সে বাধ্য। কেবল আইনের ভয়েই নয়, নৈতিক বোধ হতেও সোভিয়েট পুরুষরা আজকাল এ দায়িত্ব এড়াবার চেষ্টা করে না।

বিবাহবিচ্ছেদের পর বিশেষ কোন কারণ না থাকলে সন্তান লালন-পালনের ভার সাধারণত মায়েরাই পেয়ে থাকেন। সেক্ষেত্রে পিতাকে এক সন্তানের জন্য তার আয়ের এক চতুর্থাংশ, দুই সন্তানের জন্য এক তৃতীয়াংশ এবং তিন বা ততোধিক সন্তান থাকলে তাদের জন্য

আয়ের অর্ধাংশ দিতে হয়। সন্তানের জননী তা পেয়ে থাকেন। অবিবাহিত জীবনে সন্তান জন্মালেও এ দায়িত্ব পালন করতে হয়।

সোভিয়েট পারিবারিক জীবনে ধর্মের প্রভাব সম্পর্কে এখানে দু'চার কথা বলা দরকার। সোভিয়েট রাষ্ট্র ধর্মকে বাদ দিয়ে চললেও ব্যক্তিগত জীবনে ধর্ম সেখানে নিষিদ্ধ হয় নি। ধর্মব্যাপারে রাষ্ট্রের কোন উৎসাহ নেই এবং কোন ধর্ম প্রতিষ্ঠানই রাষ্ট্রের সমর্থন বা অর্থ-সাহায্য পায় না। কিন্তু কোন ধর্মমতের প্রতি রাষ্ট্রের বিদ্বেষও নেই। খৃষ্টীয়, ইসলাম, বৌদ্ধ—সকল ধর্মই রাষ্ট্রের নিকট সমান ব্যবহার পায়। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে সকলেই স্ব স্ব ধর্মমত মেনে চলতে পারে; কিন্তু ধর্মের ধ্বজা ধরে কেউ রাষ্ট্রবিরোধী কাজ করলে তা বরদাস্ত করা হয় না।

কারখানায় জীবিকার্জন

রুশ-জার্মান যুদ্ধ বাধার ফলে সোভিয়েট কারখানায় শ্রমজীবীদের দৈনিক কাজের ঘণ্টা আগের মত ঠিক রাখা সম্ভব হয় নি। যুদ্ধের প্রয়োজনে কাজের ঘণ্টা বাড়াতে হয়েছে; কিন্তু ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ থেকে এ যুদ্ধের প্রাক্কাল পর্যন্ত সেখানে কখনও শ্রমিকদের দৈনিক খাটুনি আট ঘণ্টার বেশি হয় নি। বরঞ্চ বহু বছর শ্রমিকদের দৈনিক খাটুনি ছিল মাত্র সাত ঘণ্টা করে। বছরে তারা পনর দিন হতে এক মাস পর্যন্ত পুরা বেতনে ছুটি পেত। যুদ্ধের জরুরী প্রয়োজনে এই ছুটিটাও তাদের বন্ধ হয়ে যায়; তবে এক মাসের বেতন তাদের বেশী দেওয়ার ব্যবস্থা হয়।

আগেই বলেছি, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানই হয় ষ্টেট কিংবা কোন গণপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত এবং প্রত্যেক

শিল্প প্রতিষ্ঠানেই ট্রেড য়ুনিয়নের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত। কলকারখানায় কিরূপ উৎপাদন হচ্ছে সেই সম্বন্ধে ট্রেড য়ুনিয়ন কমিটী প্রশ্নাদি করার অধিকারী। এছাড়া কলকারখানার পরিচালনা কি ভাবে বেশী উন্নত করা যায় তা আলোচনার জন্য মাঝে মাঝে শ্রমিকদের সভা আহ্বান করা হয়। সেই আলোচনা সভায় কাউকেই ছেড়ে কথা বলা হয় না।



একজন স্ত্রীলোক রেলওয়ে-সিগন্যালারের কাজ শিখছে

কারখানার পদস্থ কর্মচারীরা যেমন সাধারণ শ্রমিকদের কাজের সমালোচনা করতে পারেন, তেমনি সাধারণ শ্রমিকরাও আবার দরকার হলে তাদের উর্দ্ধতন কর্মচারীদের কাজের সমালোচনা করে থাকে। সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যে যারা যোগ্যতার পরিচয় দেয় তাদের পদোন্নতি হতে বেশী দিন লাগে না। উচ্চপদে নিয়োগের আগে অনেক সময় তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান হয়। সেখানে বিনা খরচে তারা কারখানা পরিচালনাদি সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করে আসে।

নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান এবং ট্রেড য়ুনিয়ন এক সঙ্গে পরামর্শ করে শ্রমিকদের বেতনের হার নিরূপণ করে থাকে। সর্বনিম্ন বেতনের হার আইনেই নির্ধারিত রয়েছে; সর্বোচ্চ বেতন কত হবে তার কোন নির্দিষ্ট

সীমা নেই। তবে যারা বেশ ভাল বেতন পায়, রুশ-জার্মান যুদ্ধ বাধার পর তাদের ওপর মোটা রকম আয়কর বসান হয়। যে যে-পরিমাণ কাজ করবে সেই হারে তার বেতন নির্ধারিত হবে। এক বছর অন্তেই প্রত্যেক শ্রমিকের বেতনবৃদ্ধি সম্বন্ধে বিবেচনা করা হয়। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আরম্ভের পর এযাবৎ সোভিয়েট শ্রমিকদের বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির হার ছিল গড়ে তাদের বেতনের দশ হতে পনর ভাগ করে।

কারখানা পরিদর্শন এবং সমাজকল্যাণ বীমার টাকা বণ্টন ব্যাপারে সোভিয়েট ট্রেড য়ুনিয়নগুলির পূর্ণ কর্তৃত্ব বিদ্যমান। সমাজ-কল্যাণ বীমার টাকা প্রধানত এ ভাবে শ্রমিকদের কল্যাণে নিয়োজিত হয়:—সন্তানসম্ভবা নারী শ্রমিককে প্রসবের আগে দুমাস পুরা বেতনে ছুটি দান; তা ছাড়া অন্তসত্ত্বা অবস্থায় পুরা বেতনে হাল্‌কা কাজের ব্যবস্থা করা এবং ছ'বছর চাকরি হয়েছে এমন কোন শ্রমিক পীড়িত হলে অসুস্থ অবস্থায় তাকে পুরা বেতন দেওয়া। ছ'বছরের কম কারো চাকরি হলে অসুস্থ অবস্থায় সে বেতনের চেয়ে কিছু কম হারে ভাতা পায়। যারা ট্রেড য়ুনিয়নের সভ্য নয় তারা সমাজকল্যাণ বীমা তহবিল থেকে অন্যান্যের তুলনায় অর্ধেক সুবিধা পায়। অবশ্য সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে ট্রেড য়ুনিয়নের বাইরে শ্রমিকের সংখ্যা শত করা পনর জনের বেশী হবে কিনা সন্দেহ।

পুরুষকে ষাট বছরে এবং স্ত্রীলোককে পঞ্চাশ বছরে কাজ থেকে অবসর দেওয়া হয়। পুরুষ পঁচিশ বছর এবং স্ত্রীলোক কুড়ি বছর চাকরি করলেই পেন্সন পাবার অধিকারী। অবসর গ্রহণ করে তারা তাদের বেতনের অর্ধেক কি তার কিছু বেশী পেন্সন বাবদ পেয়ে থাকে। স্বামী মারা গেলেও বিধবা স্ত্রীকে পেন্সনের টাকা দেওয়া হয়।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে ট্রেড য়ুনিয়নের শ্রমিককল্যাণ প্রচেষ্টা কেবল

কারখানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; পারিবারিক জীবন পর্যন্তও তা সম্প্রসারিত। শ্রমিকদের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির দিকেও ট্রেড য়ুনিয়নগুলি যথেষ্ট নজর দিয়ে থাকে। অনেক সময় পারিবারিক বিবাদের নিষ্পত্তি এবং অপরাধীর বিচার ট্রেড য়ুনিয়নসমূহই করে। ট্রেড য়ুনিয়নের প্রভাব সেখানে কতখানি একটা উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে। মস্কোতে একবার একটি স্ত্রীলোক স্বামীর চরিত্রে সন্দিহান হয়ে স্বামীকে খুন করে। স্বামীর চরিত্রে সন্দেহ করার অবশ্য যথেষ্ট কারণ থাকায়ই ব্যাপারটা ঘটে। স্ত্রীলোকটির একটি শিশুসন্তান ছিল। মস্কোর আদালতে তার বিচার উঠল। আদালতে রায় দেওয়া হল, স্ত্রীলোকটির কর্মজীবন ও পারিবারিক জীবনের ইতিহাস ভাল। খুব বেশী উত্তেজনার কারণ থাকায়ই সে এমন একটা মারাত্মক কাণ্ড করে বসেছে। তাকে এখন সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখলে সে হয়ত আর কোন ভাবেই নিজকে শোধরাবার সুযোগ পাবে না। কাজেই স্থির হল সে তার পূর্ব কাজেই বহাল থাকবে এবং ট্রেড য়ুনিয়ন তার প্রতি বিশেষ নজর রাখবে যে সে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসছে কিনা। বলা বাহুল্য, স্ত্রীলোকটি অল্পদিনের মধ্যেই আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এল।

একজন খুনী আসামীকে যেখানে ট্রেড য়ুনিয়নের হাতে এ ভাবে সপে দেওয়া হয় সেখানে যে ট্রেড য়ুনিয়নের শক্তি ও দায়িত্ব কতখানি সহজেই অনুমান করা যায়।

খুব গুরুতর রকমের কোন অপরাধ করলে শাস্তি স্বরূপ ট্রেড য়ুনিয়ন থেকে তার নাম কেটে তাকে 'লেবার ক্যাম্পে' নিয়ে আটক রাখা হয়। আর অপরাধ মারাত্মক না হলে সাধারণত অপরাধীর জন্য 'ফোসড লেবার' এর ব্যবস্থা হয়। 'ফোর্সড লেবার' এর অর্থ অপরাধীকে

চাকরি থেকে না সরিয়ে স্বাধীনভাবেই জীবন যাপনের সুযোগ দেওয়া; তবে তার মাইনে থেকে জরিমানা বাবদ কিস্তি হিসাবে টাকা কাটা যাবে। অবশ্য ট্রেড য়ুনিয়ন কেবল এ করেই খালাস নয়; অপরাধীর জীবনযাত্রা প্রণালীর প্রতি সে প্রখর দৃষ্টি রাখে এবং চেষ্টা করে যাতে সমাজবিরুদ্ধ কাজের প্রবৃত্তি তার জীবনের ধারা থেকে লোপ পায়। এক এক অবস্থায় পড়ে এক এক জনের মনে দুষ্কার্যের প্রবৃত্তি জাগে। সেই অবস্থা থেকে তাকে মুক্ত করার জন্য নানা ভাবে চেষ্টা করা হয়।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে ট্রেড য়ুনিয়ন এমন প্রসার লাভ করেছে যে, বাড়ীর সাধারণ পরিচারক-পরিচারিকাদেরও ট্রেড য়ুনিয়ন রয়েছে। অনেকের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, বাড়ীতে চাকরবাকরই যদি খাটান চলে তবে আর সেখানে শ্রেণীবৈষম্য দূর হল কৈ? বিষয়টা একটু পরিষ্কার করে বলা দরকার।

রাজনৈতিক শ্রেণী বলতে আমরা যা বুঝি সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে তা নেই এবং সেভাবে এক শ্রেণীর অন্য শ্রেণীকে শোষণ করা চলে না; কিন্তু তা বলে সেখানে সকলের আয় সমান এমন মনে করাও ভুল। মুড়ি মিছরী এক দরে বিকায় না, যোগ্যতা অনুযায়ী বেতনের তারতম্য রয়েছে। তবে সোভিয়েট রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ব্যক্তির আত্মোন্নতির পথ যথেষ্ট প্রশস্ত করে দেওয়া হয়েছে। যেসব প্রতিকূল অবস্থার জন্য মানুষ সাধারণত আত্মবিকাশের সুযোগ পায় না, সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ তা থেকে মানুষকে মুক্তি দিয়েছে এবং উন্নতির পথ খোলা আছে বলেই সেখানে ছোট কাজ গ্রহণে কেউ কুণ্ঠিত হয় না। যার যেমন যোগ্যতা তেমন কাজেই সে ঢোকে, তবে জানে যে সেখানেই তার জীবনের শেষ নয়; চেষ্টা করলে সেও ক্রমশ উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারবে।

ব্যক্তির জীবনের আশাআকাঙ্ক্ষা সফল করে তোলার জন্যই সোভিয়েট রাষ্ট্র সর্বতোভাবে সাহায্য করে এবং এটাই সোভিয়েট রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য।

ট্রেড য়ুনিয়নের নির্দিষ্ট হারে বেতন দিলে গৃহস্থালী কাজে সাহায্যের জন্য সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে লোক পাওয়া অসম্ভব নয়। আমাদের দেশের ঝি চাকরের মত ব্যবহার তারা পায় না বা এক বেতনে এক অবস্থায় তাদের সারাজীবন কাটিয়ে যেতে হয় না। নিজেদের উন্নতির জন্য তারা স্ব স্ব য়ুনিয়ন থেকে যথেষ্ট সাহায্য পায়। সাধারণত কোন গ্রাম্য মেয়ে যখন সহরে কাজের সন্ধানে আসে তখন অন্য কাজের যোগ্যতা না থাকায় সে প্রথমে কোন পরিবারে পরিচারিকা রূপে প্রবেশ করে। সেখানে সে থাকাখাওয়া পায় এবং কাজে যোগ দেওয়ার পরই য়ুনিয়নের সভ্য হওয়ার জন্য তার ডাক পড়ে। য়ুনিয়নের সভ্য হলেই সপ্তাহে দুদিন সন্ধ্যাবেলা সে অবৈতনিক ক্লাসে যোগ দিতে পারে এবং সেখানে কিছু শিখে অনায়াসেই আর একটা ভাল কাজ সে পেয়ে যায়। সাধারণ স্তর থেকে একটি মেয়ে এভাবে কতখানি ওপরে উঠতে পারে অধ্যাপক প্যাট স্লোয়ান তার একটি চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,- "১৯৩২ খৃষ্টাব্দে একটি গ্রাম্য মেয়ে মস্কোতে এসে প্রথমে এক পরিবারে পরিচারিকার কাজ নিয়েছিল। পরে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে সফরের সময় তার সঙ্গে আমার দেখা হল। সহরে যখন সে প্রথম এসেছিল তখন সাধারণ বর্ণজ্ঞানও তার ছিল না। আমাদের দেশের কোন ইংরেজ মালিক হলে তিনি মেয়েটিকে বলতেন 'বোকা মেয়ে।' এদেশে (ইংলণ্ডে) তার এবাড়ী ওবাড়ীতে ঝিগিরি করেই সারাজীবন কাটাতে হত, কোন উন্নতির আশাই হয়ত তার থাকত না। কিন্তু যে ফ্ল্যাট বাড়ীতে সে

প্রথম কাজ নিয়েছিল সেখানে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে যখন আমার সঙ্গে তার ফিরে দেখা হল তখন সে আমাকে বলল, 'আমি এখন একাজ ছেড়ে দিয়েছি। এঞ্জিনিয়ার হওয়ার জন্য আমি বর্তমানে একটা ল্যাবরেটরীতে কাজ শিখছি'।"

এই রূপান্তর কেবল জন কয়েকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সমগ্র সোভিয়েট সমাজই একটা বিরাট রূপান্তরের মধ্য দিয়ে এভাবে তার চরম লক্ষ্য পূর্ণ সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে চলেছে।

যৌথ চাষ

বিপ্লবের আগে আমাদের দেশের জমির মতই রুশিয়ায় খণ্ড খণ্ড ভাবে জমির চাষ হত। জমির উর্বরতা বাড়াবার জন্য বিশেষ কোনই চেষ্টা হত না। তার ফলে চাষীদের দারিদ্র্য লেগেই থাকত। আমাদের দেশে যেমন দুর্ভিক্ষ একটা সাধারণ নিয়মের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে, প্রাক্‌বিপ্লব রুশিয়ায়ও ঠিক এমনি অবস্থা চলেছিল। অনশন, অর্ধাশন ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। 'ডেলী টেলিগ্রাফ' পত্রিকার সংবাদদাতা ই° জে° ডিলন একবার লিখেছিলেন, "তুষারপাত, সাইবেরিয়ার প্লেগ প্রভৃতির ন্যায় দুর্ভিক্ষও রুশিয়ায় প্রতি বছর ঘুরে ঘুরেই আসে।"

চাষীদের এই অবর্ণনীয় দুঃখদারিদ্র্য দূর করার জন্যই সোভিয়েট আমলে যৌথ চাষ প্রবর্তন করা একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়ে। চাষীরা যাতে একত্র হয়ে সব বড় বড় খামারে চাষ করতে পারে তার জন্য গবর্ণমেণ্ট থেকে চাষের নানাবিধ যন্ত্রপাতি দিয়ে সাহায্য করা হয়। কেবল যন্ত্রপাতিই নয়, আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে যাতে চাষ হতে পারে তার জন্য গবর্ণমেণ্ট বিভিন্ন এলাকায় কৃষিবিদ্যালয় ও ছোট ছোট

গবেষণাগার স্থাপন করে দেয়। তা ছাড়া কৃষকরা যাতে ফসলের উত্তম দাম পায় গবর্ণমেণ্ট তারও ব্যবস্থা করে। ১৯২৮ থেকে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যৌথ চাষপ্রণালী সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপক ভাবে প্রবর্তিত হয়। অবশ্য অবস্থাপন্ন কৃষকরা প্রথম দিকে এ ব্যবস্থার ঘোর বিরোধিতা করে। প্রতিবেশী দরিদ্র চাষীদের সঙ্গে একত্রে



একটি যৌথ কৃষিগবেষণাগারে গ্রাম্য চাষীরা শস্যের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করছে

খামারে কাজ করা অপেক্ষা তারা বরঞ্চ হালগরু নষ্ট করে ফেলাই শ্রেয় মনে করত। ফলে কোন কোন এলাকায় হালের গোমহিষ পাওয়া মুস্কিল হয়ে পড়ে এবং তাতে ফসলোৎপাদনের দিক দিয়ে সেই সব এলাকা অনেকদিন পিছনে পড়ে থাকে। অবশ্য ধীরে ধীরে

তারা যখন বুঝতে পারে যে, যৌথ চাষে যোগ না দিলেই ক্ষতি তখন তারা একে একে এসে যৌথ চাষে যোগ দেয়।

যৌথ চাষের সাধারণ নিয়ম এই:—একটি গ্রামের সকল চাষী তাদের জমিগুলি একত্র করে নেবে। গোমহিষাদি এবং চাষের যন্ত্রপাতিগুলিও তাদের একত্র থাকবে। তারা নিজেদের মধ্য হতে লোক নির্বাচন করে খামার পরিচালনার জন্য একটি কমিটী গঠন করবে। গবর্ণমেণ্ট তাদের ট্র্যাক্টর (কলের লাঙ্গল) এবং অন্যান্য কৃষি-যন্ত্রপাতি যোগাবে। অনেক সময়ই যৌথ খামারের তরফ হতে ট্র্যাক্টর ভাড়া নেওয়া হয়। রুশ-জার্মান যুদ্ধ বাধার আগে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে ২ লক্ষ ৪০ হাজার যৌথ খামার ছিল। সেই সব খামার যাতে সহজে ট্র্যাক্টর ভাড়া পেতে পারে তার জন্য গবর্ণমেণ্ট বিভিন্ন এলাকায় প্রায় সাত হাজার মেশিন ট্র্যাক্টর ষ্টেসন স্থাপন করে। সেইগুলির কাজ যৌথ খামারকে ট্র্যাক্টর ভাড়া দেওয়া।

যৌথ খামারে সকলেই সমান মালিক। দৈনিক আট ঘণ্টা হিসাবে সাধারণ চাষীদের রোজ ধরা হয়। সেইভাবে যার যত রোজ কাজ হয় তদনুপাতে সে ফসলের ভাগ পায়। অবশ্য সুদক্ষ চাষীরা রোজ হিসাবে কিছু বেশী পেয়ে থাকে। ফসলের একটা অংশ নির্দিষ্ট দরে গবর্ণমেণ্টের কাছে বেচতে হবে এবং আর একটা অংশ যন্ত্রপাতির ভাড়া বাবদ মেশিন ট্র্যাক্টর ষ্টেসনগুলি পাবে। তারপর কিছু ফসল পরবর্তী বছরের বীজের জন্য আলাদা করে রাখতে হবে। অবশিষ্ট ফসল যৌথ খামারের চাষীরা ইচ্ছা করলে অর্থের বিনিময়ে বেচে দিতে পারে অথবা বছরে যার যত রোজ কাজ হয়েছে তদনুসারে ফসল বণ্টন করেও দেওয়া চলে। এছাড়া সমাজহিতের জন্য যৌথ খামারের পরিচালকগণ সম্ভব হলে ফসলের একটা অংশ বাঁচিয়ে সর্বসাধারণের তহবিল খুলতে পারে।

অনেক ক্ষেত্রে এভাবে চাষীরা নিজেদের লাইব্রেরী, ক্লাবঘর, বিশ্রামাগার প্রভৃতি স্থাপন করেছে। যৌথ খামারের কোন অংশীদার বৃদ্ধ হলে তার জন্য অবশ্যই পেন্সনের ব্যবস্থা করতে হয়।

যৌথ চাষীরা বিনা খাজনায় বাড়ী ও বাগানের জন্য জমি পেয়ে থাকে। তা ছাড়া গোচারণাদির জন্যও তাদের যথেষ্ট জমি দেওয়া হয়। এক এক এলাকায় প্রয়োজন অনুসারে এক এক রূপ নিজস্ব গৃহপালিত পশু রাখার অনুমতি তারা পায়। যৌথ খামারে যে চাষীদের যোগ দিতেই হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তবে যৌথ খামারে যোগ না দিলে চাষীদের কিছু বেশী হারে ট্যাক্স দিতে হয় এবং এটা খুবই স্বাভাবিক যে, একটি গ্রামের দশজন চাষীর মধ্যে যখন নয়জনই যৌথ খামারে যোগ দেয় তখন তাদের ভাগেই ভাল জমিগুলি পড়ে এবং যে বাইরে থাকে তার ভাগে ভাল জমি পড়তে পারে না।

কারা কত বেশী ফসল উৎপাদন করতে পারে তা নিয়ে বিভিন্ন যৌথ খামারের চাষীদের মধ্যে দস্তুরমত প্রতিযোগিতা চলে এবং গবর্ণমেন্টের কাছ থেকে তারা নানা ভাবে উৎসাহ পায়। যৌথ চাষের ফলে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে ফসলোৎপাদন কি পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে নিম্নের কয়েকটি হিসাব হতেই তা বোঝা যাবে:—

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে জারশাসিত রুশিয়ায় যে পরিমাণ বীজশস্য উৎপন্ন হয়েছিল ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে উৎপন্ন হয় তার দেড় গুণ। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের তুলনায় ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে আলুর চাষ বেড়ে প্রায় তিনগুণে গিয়ে দাঁড়ায়। চিনির উৎপাদনও তেমনি বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়। চা এবং লেবু জাতীয় ফলের চাষ এত বেশী হয় যে দেশের চাহিদা মিটাবার জন্য সেগুলি বাইরে থেকে আমদানী না করলেও চলে।

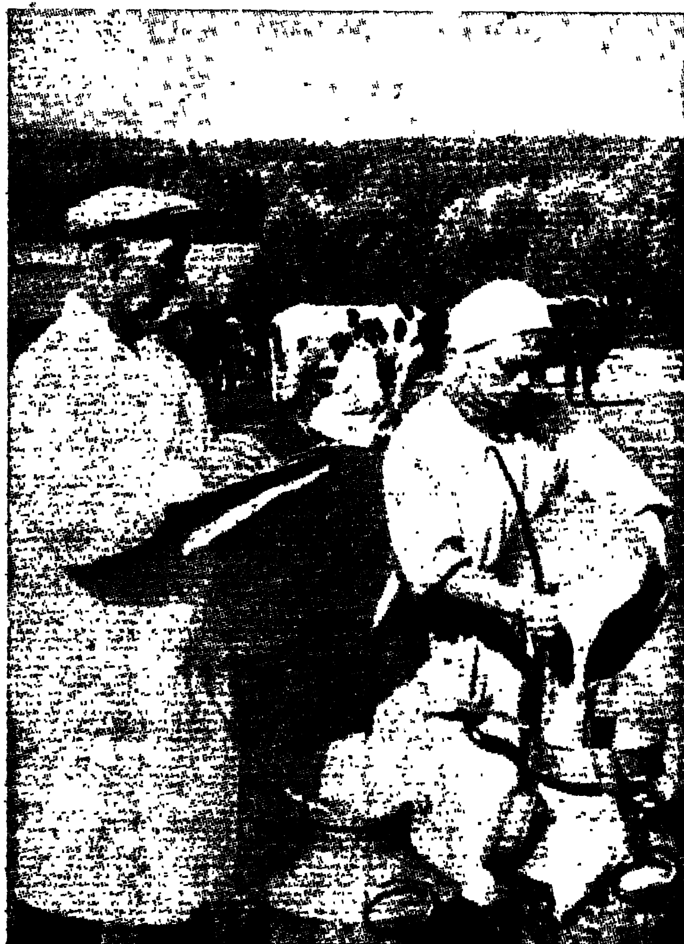
ইচ্ছা করলে আরো দীর্ঘ ফিরিস্তি দেওয়া যায়; কিন্তু তা দিয়ে আর এ প্রসঙ্গ বাড়াব না।

জনস্বাস্থ্য

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে এপর্যন্ত বিজ্ঞানকে মানবকল্যাণে নিয়োজিত করার চেষ্টা হয়েছে সব চেয়ে বেশী এবং সেজন্যই সেখানে কর্তৃপক্ষের সর্বদা দৃষ্টি রয়েছে জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার ওপর। সেখানে কেবল রোগ হলে আরোগ্যের ব্যবস্থাই করা হয় নি, রোগ যাতে না হতে পারে তারও চেষ্টা করা হয়েছে। রোগের মূলোৎপাটনের জন্য বিজ্ঞানীরা নানা ভাবে গবেষণা করেছেন এবং তাঁদের গবেষণার ফল সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ কাজে লাগিয়েছেন। এখানেও অন্যান্য দেশের সঙ্গে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের পার্থক্য রয়েছে। পুঁজিতন্ত্রী দেশগুলিতে অনেক ক্ষেত্রে পুঁজিপতিরা বিজ্ঞানীদের গবেষণাজাত ফল অর্থ দিয়ে কিনে নেন এবং তা পেটেণ্ট করে বাজারে বেঁচে প্রচুর লাভ করেন। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে তা হবার উপায় নেই। ব্যক্তিগত মুনাফার জন্য কেউ বিজ্ঞানী নিয়োগ করতে পারে না বা কোন বিজ্ঞানী নিজেও ব্যাবসা করতে পারেন না। বিজ্ঞানীর কাজ গবেষণার দ্বারা রাষ্ট্রকে সাহায্য করা এবং রাষ্ট্রের কাজ বিজ্ঞানীর গবেষণালব্ধ ফলকে গণকল্যাণে নিয়োজিত করা। অবশ্য বিজ্ঞানীর গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা এবং গবেষণার কাজে তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে সকলেরই বিনা পয়সায় চিকিৎসা করাবার অধিকার আছে। কারো অসুখ করলেই সে তার স্থানীয় ক্লিনিকে চলে যাবে। প্রত্যেক ক্লিনিকেই বিভিন্ন রোগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

রয়েছেন। কারো হাসপাতালে থেকে চিকিৎসা করাবার দরকার হলে



সোভিয়েট সরকারী দুগ্ধশালা।

বিনা খরচেই সে হাসপাতালে ভর্তি হতে পারবে। হাসপাতালে

ভর্তি হওয়ার জন্য উৎকোচ স্বরূপ কোন ডাক্তারকে 'প্রাইভেট কলের' নাম করে টাকা দিতে হবে না। গবর্ণমেণ্ট কিংবা কোন গণপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রত্যেক ডাক্তার ও নার্স নিযুক্ত হন। ইচ্ছা করলে তাঁরা প্রাইভেট প্র্যাকটিসও করতে পারেন এবং কোন রোগী নিজের খরচায় চিকিৎসা করাতে চাইলে অনায়াসেই সে তা করাতে পারে। পাব্লিক ক্লিনিকগুলিতে রোজ হিসাবে ডাক্তারদের সাধারণত ছ' ঘণ্টা এবং নার্সদের আট ঘণ্টা করে খাটতে হয়।

প্রথমেই বলেছি, রোগ আরোগ্যের ব্যবস্থার সঙ্গে রোগের মূলোৎপাটনের জন্যও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে নানাভাবে চেষ্টা করা হয়েছে। মধ্য এশিয়ায় কৃষির জন্য যে নতুন সেচের ব্যবস্থা হয় তাতে মশা জন্মে না ম্যালেরিয়ার সৃষ্টি হতে পারে তার জন্য আগে থেকেই কর্তৃপক্ষ সব বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা করেন। ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের মত আর কোন দেশ এত ব্যাপক আয়োজন করেছে কিনা সন্দেহ। জলা জায়গায় যাতে মশার সৃষ্টি না হতে পারে তার জন্য সব খাল কেটে জলের স্রোত বইয়ে দেওয়া হয়েছে। যেখানে বিস্তৃত এলাকা জুড়ে জল না রাখলে চলে না সেখানে বিমান থেকে মশকনাশক তেল ছড়িয়ে দেওয়া হয়। তাছাড়া মশার ডিম খেয়ে ফেলবার জন্য কর্তৃপক্ষ সেই সব জলাশয়ে মশকভুক মাছও ছেড়ে দেন। যক্ষ্মারোগ নিবারণের জন্যও নানা ভাবে ব্যবস্থা করা হয়েছে। যক্ষ্মারোগ প্রতিষেধের নিমিত্ত ব্যাপকভাবে চেষ্টা করা তো হয়ই, তাছাড়া নানাস্থানে যক্ষ্মারোগীর চিকিৎসার জন্য অসংখ্য ক্লিনিক ও স্বাস্থ্যনিবাস ছড়িয়ে রয়েছে। সেখানে রোগী রেখে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করা হয়।

কারখানাদিতে সাধারণত যেসব অদ্ভুত ধরণের রোগ দেখা দেয়

তার চিকিৎসা ও রোগের মূল কারণ দূরীকরণের জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করা হয়। এই শ্রেণীর রোগ নিবারণের জন্য একটি স্বতন্ত্র চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানই স্থাপিত হয়েছে। সেখানে রোগের মূল কারণ নির্ণয়ের দিকে কিভাবে নজর দেওয়া হয় একটি উদাহরণ হতেই তার খানিকটা আভাস মিলবে। কয়েক বছর আগে মস্কোতে একজন শ্রমিকের আঙুলের মাথায় একটা ঘা হয়। সাধারণ চিকিৎসায় তার কিছুই হল না দেখে ট্রেড য়ুনিয়ন তাকে 'ইনষ্টিট্যুট অব ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডিজিজ' অর্থাৎ যেখানে কারখানাজাত রোগের চিকিৎসা হয় সেখানে পাঠাল। নানাভাবে পরীক্ষার পর দেখা গেল যে, উক্ত শ্রমিক যে ধরণের কাজ করে তা থেকেই এই বিষাক্ত ঘায়ের সৃষ্টি। রোগের মূল নির্ণয়ের পর তাকে আরোগ্য করা হল। কিন্তু সেখানেই শেষ হল না; সেই ইনষ্টিট্যুট হতে প্রত্যেক কারখানায় চিঠি গেল যে, এই ধরণের কাজে যেসব শ্রমিক নিযুক্ত আছে তাদের সম্বন্ধে যেন চিঠিতে বর্ণিত নির্দেশগুলি মেনে চলা হয়; কেন না তা না হলে তারাও এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

কেবল কারখানার শ্রমিক নয়, সর্বসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার দিকে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের প্রখর দৃষ্টি রয়েছে বলেই সেখানে মৃত্যুর হার আগের তুলনায় অনেক কমে গিয়েছে এবং সমগ্র জাতি এভাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে; কারণ স্বাস্থ্যই জাতির প্রধান সম্পদ।

সংস্কৃতি ও সভ্যতা

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে মানুষের জীবনকে কেবল কর্মব্যস্তই করে তোলা হয় নি; খেলাধুলা, আমোদপ্রমোদ ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিয়ে সোভিয়েট সর্বসাধারণের জীবনকে আনন্দময় করে তোলা হয়েছে।

তা না হলে তাদের জীবন তিক্ত হয়ে উঠত। পুঁজিতন্ত্রী দেশগুলিতে প্রধানত অভিজাত ও মধ্যবিত্তদের চিত্তবিনোদনের জন্যই নানা আমোদ-প্রমোদ ও বিলাসব্যসনের আয়োজন থাকে; কিন্তু সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে সেই শ্রেণীবৈষম্য দূর করে শিল্পকলা, আমোদপ্রমোদ ও খেলাধূলাকে সর্বসাধারণের অভিগম্য করে তোলা হয়েছে। সাধারণ শ্রমিক এবং কৃষকও আজ সংস্কৃতির আনন্দরসে বঞ্চিত নয়। ক্ষেত্রপ্রসারের ফলে সোভিয়েট সংস্কৃতির অপকর্ষ না ঘ'টে কি ভাবে তার উন্নতি হয়েছে এখানে সংক্ষেপে তাই আলোচনা করব।

প্রথমেই বলা দরকার যে রুশ-জার্মান যুদ্ধ বাধবার আগে সোভিয়েট শ্রমিকরা বছরে যত ছুটি ও বিশ্রাম উপভোগ করেছে, জগতে আর কোন দেশেই শ্রমিকরা তা পায় নি; অথচ তা সত্ত্বেও শিল্পোৎপাদনের দিক দিয়ে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র কতখানি এগিয়েছে রুশ-জার্মান যুদ্ধেই তা ভাল ভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

সোভিয়েট শ্রমিক ও কৃষকদের অবসর সময় ও ছুটির দিনগুলি কাটাবার জন্য যেসব ব্যবস্থা হয়েছে প্রথমে তৎসম্পর্কেই বলি। প্রত্যেক বড় কারখানা ও যৌথ খামারের সংশ্লিষ্ট একটি করে ক্লাব রয়েছে। বড় ক্লাবগুলিতে একটি করে নাট্যশালা ও সিনেমাঘর, খেলাধূলার সাজসরঞ্জাম এবং গানবাজনার নানারূপ বাদ্যযন্ত্রাদি থাকে। সেই সব ক্লাবে গিয়ে অধিকাংশ শ্রমিক ও কৃষক তাদের অবসর সময় আমোদআহ্লাদে কাটায়। তাছাড়া সহরের পার্কগুলিতেও অবসর সময় কাটাবার মত নানারূপ ব্যবস্থা রয়েছে। মস্কোর 'পার্ক অব কালচার এণ্ড রেষ্ট' দেখে বহু বিদেশী পর্যটকই তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। সেখানে কেবল বেড়াবার জন্য রাস্তা ও বসার জন্য কয়েকটা আসনের ব্যবস্থা করেই কর্তৃপক্ষ কর্তব্য সারেন নি; থিয়েটার, সিনেমা,

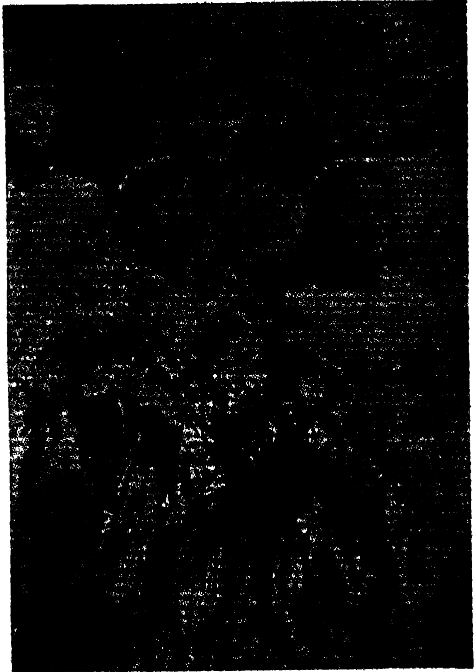
লাইব্রেরী, পাঠাগার, খোলা নাচমঞ্চ এবং উন্মুক্ত স্থানে থিয়েটার করার জন্য এক বিরাট নাটমঞ্চ রয়েছে। এত বড় খোলা নাটমঞ্চ জগতে আর কোথাও নেই। কেবল তাই নয়। শিশুদের খেলাধূলা ও আমোদ-প্রমোদের জন্য সেখানে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা হয়েছে। গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় সেই উদ্যান আনন্দকোলাহলে মুখরিত হয়ে ওঠে, আর শীতকালে সেটা আইস-স্কেটিং ও স্কী-ইংএর জন্য ব্যবহৃত হয়।

তারপর সহরের অদূরে বনের ধারে কি কোন নদীর তীরে সব বিশ্রামভবন রয়েছে। শ্রমিকরা বেড়াবার জন্য সেখানে গিয়ে একদিন করে থেকে আসতে পারে। বিশ্রামভবনগুলি ট্রেড য়ুনিয়ন কর্তৃক পরিচালিত হয়। তাছাড়া কারখানার পরিচালকগণ শ্রমিকদের মাঝে মাঝে সব ভাল থিয়েটার, যাদুঘর, চিত্রশালা প্রভৃতি দেখতে পাঠান। অনেক সময় তাদের দেশভ্রমণেও পাঠান হয়।

এক কথায় বলতে গেলে সোভিয়েট শ্রমিকদের কেবল কারখানার যন্ত্রপাতির সঙ্গেই সম্পর্ক থাকে না; তারা নাচে, নাটক করে, সাহিত্য চর্চা করে, ছবি আঁকে, ফটোগ্রাফি শিখে, গান গায়, বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করে এবং বিদেশী সাহিত্য পড়ে। ক্লাবগুলিতে এসব ব্যাপারে তারা রীতিমত উৎসাহ ও সাহায্য পায়। বাইরের জীবনে এই আনন্দরসের ধারা আছে বলেই কারখানায় জীবন তাদের মরুভূমি হয়ে ওঠে না। যন্ত্র তাদের কাছে দানব না হয়ে বন্ধু রূপে ধরা দিয়েছে।

খেলাধূলা সভ্যতার একটা অঙ্গ। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে সেই খেলাধূলা প্রসারের জন্য কতখানি চেষ্টা হয়েছে এবার সেই সম্বন্ধেই কিছু বলব। শারীরচর্চা ও খেলাধূলা পরিচালনার জন্য একটি কেন্দ্রীয় কমিটী রয়েছে। সেই কমিটীর অধীনে পাঁচটী সরকারী কলেজ

পরিচালিত হয়। সেই সব কলেজে ব্যায়াম ও খেলাধূলার শিক্ষক তৈরীর জন্য ছাত্র গৃহীত হয়। তারা পাশ করে বেরুলে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটদের সমান মর্যাদাই পায়। পাঁচটি কলেজে প্রায় তিন হাজার ছাত্রের পড়ার ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক ক্লাবে এই সব কলেজের পাশ করা এক একজন গ্র্যাজুয়েট ব্যায়ামশিক্ষক থাকেন।



বার্ষিক যুব-দিবসে মস্কোর রেড স্কোয়ারে সোভিয়েট তরুণ-তরুণী

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে খেলাধূলা কতখানি সম্প্রসারিত হয়েছে নিম্নের হিসাব থেকেই তার কতকটা অনুমান হবে:—সেখানে যুদ্ধ বাধার আগে ৬৫০টি ষ্টেডিয়াম (আসবাব ও বসার আসনযুক্ত খেলার মাঠ) ছিল; এক একটি ষ্টেডিয়ামে বেশ কয়েক হাজার করে লোক ধরে। মস্কোর ডায়নামো ষ্টেডিয়ামে প্রায় ৯০ হাজার লোক বসতে পারে। মস্কোতে ইসমাইলোভা নামে আর একটি নতুন ষ্টেডিয়াম তৈরী হচ্ছিল যাতে এক লক্ষ পর্যন্ত লোক ধরার কথা। যুদ্ধের দরুণ তার নির্মাণকার্য আর শেষ হতে পারে নি।

এছাড়া প্রায় আট হাজার খেলার মাঠ ও সাড়ে তিনশ' সাঁতারের মঞ্চ সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছে।

প্রত্যেকেই এক একটি খেলায় বিশেষজ্ঞ হতে পারে; তবে সাধারণত চেষ্টা করা হয় যাতে খেলোয়াড়রা 'অলরাউণ্ড স্পোর্টর্স ব্যাজ' লাভ করতে পারে। উক্ত ব্যাজের গায়ে লেখা থাকে, "শ্রম ও দেশরক্ষার জন্য প্রস্তুত।" সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৫০ লক্ষ লোক এই ব্যাজ পেয়েছে। খেলাধূলায় যারা আরো বেশী নৈপুণ্য দেখায় তাদের এর চেয়ে উচ্চাঙ্গের ব্যাজ দেওয়া হয়। তেমন ব্যাজধারীর সংখ্যা ৭০ হাজারের কম হবে না।

প্রথমোক্ত শ্রেণীর ব্যাজ লাভ করতে হলে দৌড়, হাঁটা, লাফ, সাঁতার, স্কী-ইং, স্কেটিং, গ্রেনেড নিক্ষেপ, রাইফেল ছোঁড়া, সাইকেলে চড়া প্রভৃতি বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হয়। এগুলি ছাড়া ভারোত্তলন, প্যারাশুটে অবতরণ, গ্লাইডার চালনা, স্কীর সাহায্যে লাফ, দীর্ঘ পথ দৌড়ান প্রভৃতি কঠিন বিষয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তবে শেষোক্ত শ্রেণীর ব্যাজ পাওয়া যায়।

বিপ্লবের পর সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে কতকগুলি নতুন খেলাও প্রবর্তিত হয়েছে। ফুটবল ও টেনিস খেলার প্রচলন সেখানে ছিল না; কিন্তু সোভিয়েট আমলে এই দুটি খেলা বিশেষ প্রসার লাভ করেছে। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের হিসাবে দেখা যায় সেখানে প্রায় ৪ হাজার ফুটবল টীম ও লাখ দশেক ফুটবল খেলোয়াড় রয়েছে। এছাড়া আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায়ও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র থেকে অনেকে রেকর্ড স্থাপন করেছেন; তাঁদের সংখ্যা জন পঞ্চাশেকের কম হবে না।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে খেলাধূলার ব্যাপক আয়োজন থাকায় যুদ্ধের সময় সৈন্য সংগ্রহে খুবই সুবিধা হয়েছে; কেননা খেলাধূলার

মধ্য দিয়েই সেখানকার যুবসমাজ প্রায় অর্ধেক সামরিক শিক্ষা পেয়েছে।

সভ্যতার আর একটি প্রধান অঙ্গ আমোদপ্রমোদ। বলা বাহুল্য, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে জনসাধারণের মধ্যে এই আমোদপ্রমোদ বিতরণের জন্যও বৈপ্লবিক পন্থা অনুসৃত হয়েছে। নিছক আনন্দদানের জন্যই সেখানে থিয়েটার ও সিনেমাগুলি পরিচালিত হয় না; সেগুলিকে লোকশিক্ষার বাহনও করে তোলা হয়েছে। সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ প্রথমেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, আমোদপ্রমোদের ভিতর দিয়েই গণজীবনে শিক্ষা বিস্তার করা সব চেয়ে সুবিধাজনক; কেননা নিরক্ষর বয়স্ক ব্যক্তি বর্ণবোধের প্রাথমিক নীরস স্তর উত্তীর্ণ হওয়ার উদ্যম হারিয়ে সাধারণতই যেমন শিক্ষার প্রতি বিমুখ হয়, শিক্ষাপ্রদ আমোদপ্রমোদ তাদের তেমন ভাবে বিমুখ করে তোলে না। বরঞ্চ অনেক সময় কোন কোন চিত্র তাদের মনে এমন গভীর রেখাপাত করে যা সারা জীবনেও তারা বিস্মৃত হয় না। শিক্ষাপ্রদ আমোদপ্রমোদ গণজীবনে জ্ঞানস্পৃহা জাগায় এবং নিজ জীবন সম্বন্ধে তাদের সচেতন করে তোলে। এই আত্মচেতনার উদ্রেকই লোকশিক্ষার মূল লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার অন্যতম প্রধান বাহন নাট্যশালা ও রূপালী পর্দা।

তারপর আর্টের যে কোন নির্দিষ্ট গণ্ডী বা সংজ্ঞা নেই সোভিয়েট-তন্ত্র তা প্রমাণ করেছে। মানুষের সামাজিক চেতনা ও পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আর্টের রূপও বদলে যায়। জারের আমলে যে আর্ট কেবল অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল সোভিয়েট জনসাধারণের কাছে তার কোন আবেদন ছিল না। সোভিয়েটতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ফলে সেখানে যেমন গণজীবনের পরিবর্তন ঘটেছে তেমনি

সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আর্টকে আবদ্ধ রাখতে চান নি। যে আর্ট দেশ, কাল, পাত্রের অতীত তার যথার্থ সমাদর সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র-বাসীরা করতে জানে এবং রসবোধ তাদের আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। তারই জন্য সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে কেবল বিপ্লবোত্তর সাহিত্যই একাধিপত্য পায় নি, প্রাকবিপ্লব রুশসাহিত্যও যথেষ্ট সমাদর এবং প্রসার লাভ করেছে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হওয়ায় সাহিত্যের আদর বেড়েছে। রবীন্দ্র সাহিত্যের যোগ্য সমাদর আমাদের দেশে যে আজও হয় নি তার মূল কারণ এদেশের ব্যাপক দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা। এদেশে মুষ্টিমেয় শিক্ষিতের মধ্যেই রবীন্দ্রসাহিত্য অদ্যাবধি সীমাবদ্ধ রয়েছে। জাতির অন্তরতম প্রদেশে তাঁর ডাক পৌছাতে পারে নি; কাজেই আজও পর্যন্ত তিনি জাতীয় কবি হয়ে ওঠেন নি। দেশের এই দারুণ দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা দূর হয়ে যদি কোনদিন সংস্কৃতির ক্ষেত্র মুষ্টিমেয়ের গণ্ডী পেরিয়ে বৃহত্তর গণজীবনে পরিব্যাপ্ত হতে পারে তবে সেদিনই একমাত্র রবীন্দ্র-সাহিত্যের যথার্থ সমাদর হওয়া সম্ভব। শুধু তাই নয়; রবীন্দ্র-সাহিত্য সত্যই লোকোত্তর কিনা—মানব মনের কাছে তার কোন চিরন্তন আবেদন আছে কিনা—এর যথার্থ যাচাই হবে সেই জাগ্রত গণচিত্তের কষ্টিপাথরে। সেদিন হয়ত সত্যই তিনি জাতীয় কবি রূপে পূজা পাবেন; তাঁর কাব্য ও সাহিত্য জন কয়েকের বিলাসবস্তু হয়ে আর থাকবে না।

থিয়েটারের ন্যায় সিনেমাও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে অদ্ভুত উন্নতি লাভ করেছে। কেবল নরনারীর প্রেমকাহিনীই সোভিয়েট ছবিগুলিতে প্রাধান্য লাভ করে না; জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিক্ষা ও সংস্কৃতির বাহন হিসাবে সেইগুলি দর্শকদের চিত্তে অপূর্ব প্রভাব বিস্তার করে। ছবির সাহায্যে

নতুন সমাজব্যবস্থার প্রতি সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা জাগাবার চেষ্টা করা হয়। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, আমোদপ্রমোদের মধ্যেও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত জাতির বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার চেষ্টা করা হয় এবং তার বিশেষ প্রমাণ মিলে 'মে দিবস' ও 'নবেম্বর দিবস'-এর উৎসবে। সহর হতে সুদূর পল্লী পর্যন্ত সেই উৎসবে যে আনন্দের বন্যা প্রবাহিত হয় তাতে থিয়েটার সিনেমা থেকে আরম্ভ করে লোকনৃত্য ও পল্লীসঙ্গীত পর্যন্ত কিছুই বাদ পড়ে না। বিভিন্ন জাতির লোক তাদের জাতীয় পোষাক পরে নাচগান, খেলাধূলা, আমোদপ্রমোদ প্রভৃতি করে থাকে। নানা বৈচিত্র্যে সমগ্র সোভিয়েট জীবন ঐক্যের মধ্যেও সেই আনন্দোৎসবের দিনে এক বিচিত্র রূপ পরিগ্রহ করে।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রত্যেক জাতিকে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে কিরূপ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে অধ্যাপক প্যাট স্লোয়ান তাঁর "Russia without Illusions" পুস্তকে এ সম্বন্ধে একটি চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন :—

"জর্জিয়ান সোভিয়েট রিপাব্লিকে এক এক জায়গায় এক এক রকম ভাষা রয়েছে। যেসব স্থানে জর্জিয়ান ভাষা প্রচলিত নয় সেখানে বিদ্যালয়সমূহে স্থানীয় অধিবাসীদের মাতৃভাষাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়; জর্জিয়ান ভাষা ছেলেমেয়েরা সেখানে অতিরিক্ত ভাষা হিসাবে শিখে। একদিন এক গ্রাম্য চাষীর সঙ্গে কথোপকথনের সময় আমি এক নতুন সত্যের সন্ধান পাই। সে একজন ঝানু বিপ্লবী। বিদেশীরা সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যখন 'ইণ্টারভেন্সনের' মুখোস পরে অভিযান চালিয়েছিল তখন এই চাষী তাদের বিরুদ্ধে লড়েছিল। এখন সে একটি গ্রাম্য সোভিয়েটের সদস্য। তার মুখে এক অপূর্ব

অভিযোগ শোনা গেল। অভিযোগ আর কিছুই নয়—তার গ্রামের ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ে রুশ ভাষা শিখতে পারছে না। ছেলেমেয়েরা তাদের মাতৃভাষা শিখছে, নিজেদের রিপাব্লিকের ভাষা জর্জিয়ানও শিখছে, কিন্তু রুশ ভাষা শিখাবার জন্ত সেখানে কোন শিক্ষক নেই। অথচ বিপ্লবের আগে ককেসাসবাসীদের একটা বড় অভিযোগ ছিল এই যে, রুশ সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট রুশ প্রভাব বিস্তারের জন্ত তাদের ওপর জোর করে রুশ ভাষা চাপিয়ে দিয়ে তাদের মাতৃভাষার সর্বনাশ করছিল। সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট সেই নীতি একেবারে পবিবর্তিত করে প্রত্যেক জাতিকে এমন কি ছোট ছোট উপজাতিগুলিকে পর্যন্ত তাদের মাতৃভাষায় বলতে, লিখতে ও ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানে স্বাধীনতা দিয়েছে। প্রত্যেক জাতি এভাবে তাব মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভের স্বাধীনতা পেয়েছে বলেই ককেসাসে একটা ক্ষুদ্র জাতির একজন কৃষকের মুখে আমি সত্যিকারের দাবী শুনতে পেলাম যে তার ছেলের রুশ ভাষা শেখা দরকার। সে বলল, 'রুশ ভাষা না শিখলে কেবল আমাদের নিজেদের রিপাব্লিকেই ঘোরা চলে। কিন্তু সমগ্র সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে ঘুরতে হলে রুশ ভাষা জানা একান্ত আবশ্যক। সেজন্তই আমরা আমাদের বিদ্যালয়ে একজন রুশ শিক্ষক পাঠাবার জন্ত অনুরোধ করছি।"

এর পরই অধ্যাপক প্যাট স্লোয়ান বলছেন :—

"উত্তর ওয়েলসে আমি প্রায়ই দেখতাম সেখানে ইংরেজী ভাষায় পড়তে ও পরীক্ষা দিতে অনেক ছাত্রেরই খুব অসুবিধা হয়, কেননা ইংরেজী ভাষাটা ঠিক তাদের মাতৃভাষা নয়। ওয়েলশ জাতীয় আন্দোলনের মূলে এটা একটা মস্ত বড় কারণ। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করার পর ওয়েলশ জাতির প্রতি এ বিষয়ে আমার সহানুভূতি

জন্মে ; কিন্তু ওয়েলসে যখন ছিলাম তখন আমার এ সহানুভূতি ছিল না। এখন আমি দেখছি, ইংরেজীর পরিবর্তে মাতৃভাষায় তাদের ছেলেপিলেদের শিক্ষার দাবী অসঙ্গত নয়।”

অথচ রাষ্ট্রভাষার নামে হিন্দুস্থানী চাপাবার চেষ্টা করতে গিয়ে আমাদের দেশে কিছুদিন আগে মাদ্রাজের কংগ্রেসী প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত রাজগোপালাচারী কি কাণ্ডই না করেছেন। তিনি সেখানে বিদ্যালয়গুলিতে জোর করে হিন্দুস্থানী ভাষা চালাতে গেলেন এবং তার প্রতিবাদ করায় দুজনের জেল পর্যন্ত হল। হিন্দুস্থানী ভাষার প্রচলন হয়ত অবাঞ্ছনীয় নয় ; কিন্তু কোন প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক রাষ্ট্রভাষার নামে জোর করে তা চালাতে যাওয়া স্বৈরাচারেরই পরিচায়ক। রাষ্ট্রভাষা হওয়ার দাবী যদি হিন্দুস্থানীর সত্যই থেকে থাকে লোক নিজের প্রয়োজনে স্বেচ্ছায়ই তা শিখবে ; জোর করে তা চাপাবার প্রয়োজন হবে না।

অবশেষে একথা বলেই এই প্রসঙ্গ শেষ করব যে, সোভিয়েট শাসনে সেখানকার জনসাধারণ কেবল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই মুক্তি পায় নি ; জ্ঞানবিজ্ঞান, শিল্পকলা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তারা মুক্তি পেয়েছে।

পরিকল্পিত অর্থনীতি

আগেই বলেছি সমগ্র দেশ সংগঠনের জন্য সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে পরিকল্পিত অর্থনীতি অবলম্বিত হয়। ১৯২৮ থেকে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ এতদুদ্দেশ্যে তিন বার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সেই পরিকল্পনানুযায়ী কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান, শিক্ষা, সমাজগঠন এবং প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের সন্ধানে দেশের অভ্যন্তরে

নানা দিকে অভিযান চলে। যে মধ্য এশিয়ায় একদিন একটা বিরাট সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, জারের আমলে ক্রমশ সেটা মরুভূমিতে পরিণত হয়। সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা আবার সেখানে জমি উর্বর করার জন্য সেচের ব্যবস্থা করেন এবং ধীরে ধীরে সেই মরু অঞ্চলে লোকালয় গড়ে ওঠে। তারপর চির তুষারাবৃত উত্তর মেরু অঞ্চল আবিষ্কার ও সেখানে সভ্যতার বিস্তার সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের এক অক্ষয় কীর্তি। উত্তর মেরু অঞ্চল আবিষ্কারের ফলেই য়ুরোপের উত্তর দিক দিয়ে পশ্চিম য়ুরোপের সঙ্গে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের একটা স্থায়ী সামুদ্রিক বাণিজ্যপথ স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। এপথ যে রুশ-জার্মান যুদ্ধে কতটা কাজে এসেছে তা বোধ হয় কারো অবিদিত নেই। বৃটেন ও মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের সমরোপকরণ নিয়ে বহু জাহাজ এই উত্তরপথেই সোভিয়েট বন্দর আর্কএঞ্জেলে গিয়ে উপনীত হয়। চেল্যুস্কিন অভিযানের নেতা অধ্যাপক অটো স্মিডিট এবং তুষারাবৃত সুমেরু অঞ্চলে অভিযানের নায়ক ইভান পাপানিনের নাম জগদ্বিখ্যাত। এছাড়া যে বৈমানিক দল প্রথম সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র থেকে সুমেরু অঞ্চল হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যায় তাদের দানও কম নয়। বরফাচ্ছন্ন দেশের ওপর দিয়ে বিমান চালনায় যেসকল বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক অভিজ্ঞতা তাদের লাভ হয় উত্তরকালে রুশ-জার্মান যুদ্ধে সেগুলি বিশেষ ভাবেই কাজে লাগে।

সোভিয়েট পরিকল্পিত অর্থনীতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা এ পুস্তকে সম্ভব নয়; তবে তিনটি পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় সোভিয়েট ভূমিতে যে কি আশ্চর্য উন্নতি হয়েছে সংক্ষেপে তার কিছু হিসাব না দিলে চলে না। এখানে বলা দরকার যে, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আরম্ভ হয় ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে এবং ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরি-কল্পনা শেষ হবার কথা ছিল; কিন্তু তার আগেই ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের

জুন মাসে নাৎসী জার্মানী সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রকে আক্রমণ করে বসে। কাজেই তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আর শেষ করার সুযোগ সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ পান নি। কিন্তু পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁরা কাজ যে প্রায় শেষ করে এনেছিলেন সোভিয়েট প্রতিরোধশক্তিতেই তার প্রমাণ মিলে। এই যুদ্ধের মধ্যেও সেদিন উরাল অঞ্চলে ম্যাগনিটোগরস্ক লৌহ ও ইস্পাতের কারখানায় এক বিরাট চুল্লী স্থাপিত



অধ্যাপক অটো স্মিডিট বরফের দেশে তাঁর শ্বেত ভল্লুক নিয়ে খেলছেন

হয়েছে। এত বড় চুল্লী য়ুরোপের আর কোন দেশে আছে কিনা সন্দেহ।

১৯৪০ খৃষ্টাব্দের হিসাবে দেখা যায়, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে কারখানায় শ্রমজীবীর সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি। আর ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে সেখানে শ্রমজীবীর সংখ্যা ছিল মাত্র ১ কোটি ১০ লক্ষের সামান্য কিছু বেশী। তারপর কয়লা, বিদ্যুৎ ও খনিজ তেলের হিসাবে দেখা যায়, যেখানে

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে জারশাসিত রুশিয়ায় ২ কোটি ৯০ লক্ষ টন কয়লা বছরে আহরণ করা হত, সেখানে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে খনি হতে বছরে কয়লা আহরিত হচ্ছে ১৬ কোটি ৪০ লক্ষ টন। বিদ্যুৎ উৎপাদনও ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের তুলনায় ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে প্রায় একুশ গুণ বেড়ে যায়। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তেলোৎপাদন হত ৯০ লক্ষ টন, আর ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের হিসাবে দেখা যায় সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে ৩ কোটি ২০ লক্ষ টন তেল উৎপাদিত হয়েছে।

শিল্পসম্প্রসারণের ফলে তাদের নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনের জিনিস কি পরিমাণ বেড়ে যায় দু'একটি হিসাব হতেই তা বোঝা যাবে। জারশাসিত রুশিয়ায় ১৫ কোটি অধিবাসীর জন্য বছরে ২ কোটি জোড়ার বেশী জুতা প্রস্তুত হত না। সেখানে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে বছরে প্রায় ১৬ কোটি ৪০ লক্ষ জোড়া জুতা প্রস্তুত হয়। তারপর ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের তুলনায় ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে সেখানে কার্পাস বস্ত্রোৎপাদনও দ্বিগুণ পরিমাণে এসে দাঁড়ায়।

কেবল কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রেই এই উন্নতি সীমাবদ্ধ রয় নি; সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য এবং সমাজকল্যাণ প্রচেষ্টায়ও এক অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে। আগেই বলেছি, ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের তুলনায় ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা এসে দাঁড়ায় ৮০ লক্ষ থেকে ৩ কোটি ২০ লক্ষে; বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীসংখ্যা ১ লক্ষ ১২ হাজার হতে বেড়ে ৬ লক্ষ ২০ হাজার হয়; হাসপাতালগুলিতে রোগীর শয্যার সংখ্যা ১ লক্ষ ৭৫ হাজার থেকে বেড়ে ৮ লক্ষ ৪০ হাজারে এসে দাঁড়ায় এবং ডাক্তারের সংখ্যা ২০ হাজার হতে বেড়ে ১ লক্ষ ২০ হাজারে গিয়ে পৌঁছায়। নাট্যশালা ও সিনেমার সংখ্যা কত বেড়ে যায় পূর্বেই তা বলেছি।

এবার সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বাসগৃহ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলে এ অধ্যায় শেষ করব। বিপ্লবের পর সোভিয়েট কর্তৃপক্ষকে প্রধানত যেসকল সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হয়, বাসগৃহসমস্যাকে তা থেকে বাদ দেওয়া চলে না। বিশেষত প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ আরম্ভ হওয়ার পর যখন সেখানকার গণজীবনে আর্থিক উন্নতি দেখা দেয় এবং শ্রমজীবী হওয়ার আশায় গ্রাম ছেড়ে লোকের সহরে আসার দিকে ঝোঁক পড়ে তখন বাসগৃহসমস্যা নিয়ে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষকে কিছুকাল ভালভাবেই বিব্রত হতে হয়। সমস্যা পূরণের জন্য অতিশয় তাড়াহুড়ার মধ্যে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ তখন যেসব বাড়ী নির্মাণ করান সেগুলি দেখেই অনেক বিদেশী সাংবাদিক অপপ্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যাপারটাকে বেশী ফেনিয়ে তোলেন। গ্রাম থেকে যারা তখন সহরে এসেছিল তারা সেই সব বাড়ী পেয়েই যথেষ্ট খুসী হয়েছিল; কারণ অনেককেই পল্লীজীবনে যে দুর্দশার মধ্যে কাটাতে হত তার তুলনায় এ ছিল তাদের কাছে স্বর্গরাজ্য; কিন্তু অসন্তোষটা বেশী প্রকাশ করত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। সোভিয়েট ভূমিতে শ্রেণীবৈষম্য তখনও একেবারে লোপ পায় নি। ব্যবহারিক জীবনে সুযোগ না পেলেও মধ্যবিত্ত ঘরের মনোভাব তখনও পর্যন্ত অনেকের মধ্যেই বেশ প্রবল ছিল এবং সেই মনোভাবাপন্ন লোকই সুযোগ পেলে বিদেশীদের কাছে গোপনে সোভিয়েট ব্যবস্থার শ্রাদ্ধ করে জারের আমলের মহিমা কীর্তন করত। প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার ব্যর্থতা প্রমাণের জন্য বিদেশে যত প্রচারকার্য হয়েছে তাতে খানিকটা ইন্ধন যুগিয়েছে জারের আমলের এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী। আগে দেশবাসীর একটা বিরাট অংশকে অনশনে, অর্ধাশনে রেখে তারা যে সুখ ভোগ করত, সোভিয়েট আমলে সেই গৃহহীন নিরন্নদের

জন্ত গ্রাসাচ্ছাদন ও বাসস্থলের ব্যবস্থা হওয়ায় তাদের ভাগে কিছু কম পড়ে যায় এবং তাতে তারা মনে মনে বেশ অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে। এই অসন্তুষ্ট মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনযাত্রার মান নিরিখেই পুঁজিতন্ত্রী দেশের বহু সাংবাদিক সোভিয়েট প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার ব্যর্থতা প্রমাণে লেখনী চালিয়েছেন। কিন্তু সত্যদ্রষ্টারা দেখেছেন ভিন্ন দিক। তাঁরা দেখেছেন এক বিশাল অনগ্রসর দেশে ব্যাপক সম্পদ বৃদ্ধি এবং অগণিত দুঃস্থের জীবনে আর্থিক ও মানসিক উন্নতি।

নতুন সমাজ গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য এই মনোভাব সেখানে ক্রমশ লোপ পায় এবং যে বাড়ীসঙ্কট দেখা দিয়েছিল তারও অনেকখানি সমাধান হয়। সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের ঐকান্তিক চেষ্টায় কেবল স্থান সঙ্কুলানেরই ব্যবস্থা হয় না, পরন্তু নতুন পরিকল্পনায় ইমারতনির্মাণও বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের আধুনিক বাড়ীগুলি স্বাস্থ্য, আরাম এবং সৌন্দর্যের দিক দিয়ে জগতের কোন দেশের তুলনায়ই নিকৃষ্ট নয়; বরঞ্চ স্থাপত্যে কোন কোন বিষয়ে সে অনেক দেশকে ছাড়িয়েই গিয়েছে। মস্কোর ভূগর্ভস্থ রেল-ষ্টেসনগুলি স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে এবং চিত্রে অতুলনীয়। মর্মরে গাঁথা সেই হর্ম্যরাজি দেখে প্রশংসা না করেছেন এমন লোক কম।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সহরগুলিতে কোন বাড়ীর ব্যক্তিগত মালিক নেই। সমস্ত বাড়ীই মিউনিসিপ্যালিটির কিংবা কোন কারখানার। কোন পরিবারের নিকট হতেই তাদের আয়ের শতকরা দশ ভাগের বেশী বাড়ীভাড়া বাবদ আদায় করা হয় না। ভাড়া আদায় করে তা বাড়ীর মেরামতাদি এবং ভাড়াটেদের নানাবিধ সুখসুবিধার জন্তই ব্যয় করা হয়। বড় বড় ফ্ল্যাট বাড়ীগুলিতে একটি করে কমিটী থাকে। সেই কমিটী স্থির করেন ভাড়ার টাকা কিভাবে খরচ করা হবে। এই

ব্যবস্থা থাকায় সেখানে বাসগৃহগুলি কতটা আরামপ্রদ হতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

সোভিয়েট শাসনব্যবস্থার ফলে সেখানকার নাগরিক জীবনে কতখানি উন্নতি হয়েছে এপর্যন্ত তারই একটি চিত্র দেবার চেষ্টা করেছি। এবার রণাঙ্গনে লাল ফৌজ ও সোভিয়েট জনসাধারণ যে বিপুল শক্তির পরিচয় দিয়েছে তার পশ্চাতে কি বিরাট সংগঠনশক্তি ও সমরপ্রস্তুতি ছিল সেকথাই বলব।

সমরপ্রস্তুতি *

সোভিয়েট সমরপ্রস্তুতি সম্পর্কে কিছু বলতে হলেই সর্বাগ্রে তার পররাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার; কেননা অনেকের মনে এ প্রশ্ন থাকা কিছু অসম্ভব নয় যে, বিশ্বের শান্তিকামী সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র পররাজ্যলোভী নাৎসী শক্তির মত বিপুল সমরায়োজন করল কেন? বিশেষত পোলাণ্ডের পতনের পর সোভিয়েট সৈন্যগণ কর্তৃক তার অর্ধেক দখল; লাটভিয়া, এস্তোনিয়া এবং লিথুয়ানিয়ায় সোভিয়েট শাসনতন্ত্র প্রবর্তন, ফিনল্যাণ্ডের সহিত সোভিয়েট শক্তির যুদ্ধ এবং রুমানিয়ার বেসারাবিয়া প্রদেশে লাল ফৌজের অভিযান প্রভৃতিকে সূত্র করে পুঁজিতন্ত্রীরা এক সময় এমন ভাবে প্রচারকার্য চালিয়েছেন এবং সমস্ত ব্যাপারটাকে এমন বিকৃত করে বুঝাবার চেষ্টা করেছেন যাতে লোকের মনে ধারণা জন্মে, নাৎসী শক্তির ন্যায় সাম্রাজ্যবিস্তারই সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। কিন্তু সাম্রাজ্যবিস্তার যে সমাজতন্ত্র-বাদের মূলনীতিবিরুদ্ধ, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিসন্ধিমূলক প্রচারকার্য চালাবার সময় তাঁরা সেই কথাটা একেবারেই বিস্মৃত হন বা চেপে যান, এবং লোকের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে এক নিঃশ্বাসে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রকে তাঁরা নাৎসী জার্মানীর স্তরে টেনে নামান। সোভিয়েটবিরোধীরা তো তাতে উল্লসিত হয়ে ওঠেনই, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যক্তিদের মধ্যেও তখন অনেকের

---

* ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুন রুশ-জার্মান যুদ্ধ বাধার অব্যবহিত পরই এই অধ্যায়ের কোন কোন অংশ প্রবন্ধাকারে 'দেশ' সাপ্তাহিক পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে লিখেছিলাম।

মনে একটা খটকা লাগে। এমন কি আমাদের দেশে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু পর্যন্ত লাল ফৌজের ফিনল্যাণ্ড অভিযানের নিন্দা করে এক বিবৃতি দেন। কিন্তু পরবর্তী ঘটনাবলীর দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ তখন ফিনল্যাণ্ডের দিকে এগিয়ে ঘাঁটি স্থাপন না করলে এবং পশ্চিমে সীমান্ত না সরালে নাৎসী বাহিনীর প্রথম আক্রমণেই তার শ্রেষ্ঠ নগরীগুলি বিপন্ন হয়ে পড়ত। রুশ রণাঙ্গনে যুদ্ধ বিলম্বিত হওয়ায় বৃটেন ও তার মিত্রশক্তিবর্গের সমরায়োজনে যে কতখানি সুবিধা হয় তা বিশেষ করে না বললেও চলে।

গত মহাযুদ্ধের ক্রোড়ে সোভিয়েট রুশিয়া জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু এই নতুনের আবির্ভাবকে সেদিন তথাকথিত "গণতন্ত্রীরা" কেউ সুনজরে দেখতে পারে নি। আজও যে পারে এমন নয়; কম্যুনিষ্টবিদ্বেষ গণতন্ত্রী শাসকগণ হামেশাই অকপট চিত্তে প্রকাশ করে থাকেন। তবে বিপাকে পড়ে আজ তাঁরা এই অন্ত্যজের মিত্র।

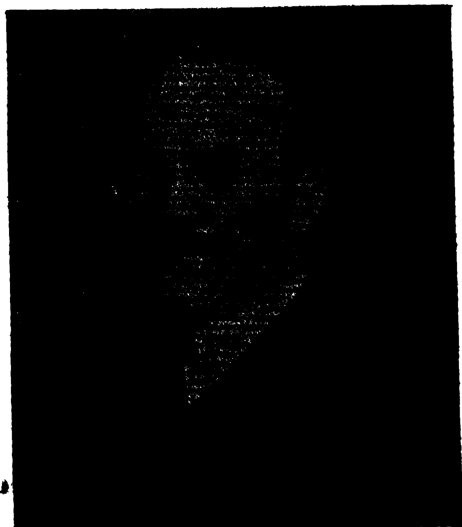
এই নবজাত শিশুকে হত্যার জন্য সেদিন চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। কেন? কিসের জন্য তার ওপর এত ক্রোধ? সেই একই কথা। সাম্রাজ্যবাদী ভিত্তিতে যে অর্থনৈতিক বনিয়াদ গড়ে উঠেছে সোভিয়েট রুশিয়ার আবির্ভাবে তা ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম হল। রুশ বিপ্লবের ফলে গণজীবনে অর্থনৈতিক চেতনা দেখা দিল এবং তাতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের শাসকবর্গ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তাঁরা ভাবলেন সাম্রাজ্যবাদ বুঝি আর টেকে না। আত্মরক্ষায় তাঁরা বদ্ধপরিকর হলেন এবং নানা কৌশলে সোভিয়েটঘেঁষা প্রজাতন্ত্রী জার্মানীকে ধনতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত করলেন। ফলে হিটলারের অভ্যুত্থান ও বর্তমান মহাযুদ্ধ। এইটেই হল এই বিশ্বগ্রাসী সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত রাজনৈতিক পটভূমি।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে জগদ্ব্যাপী অর্থনৈতিক সঙ্কটের ফলে বিভিন্ন দেশকে নানারূপ কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সেই অর্থনৈতিক ধাক্কা খেয়ে নানা দেশের সমাজব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়; দেশে দেশে কলকারখানা বন্ধ হতে আরম্ভ করে এবং তাতে জগতের বিভিন্ন দেশে পাঁচ কোটিরও বেশী লোক বেকার হয়ে পড়ে। ফসলের মূল্য কমে যাওয়ায় ভারতবর্ষে এবং কাঁচা মাল সরবরাহকারী উপনিবেশগুলিতে কৃষকদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায়। চারদিকে যখন এরূপ সঙ্কট তখন সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা সাফল্যের দিকে এগিয়ে চলে এবং তার ফলে সেখানকার অর্থনৈতিক জীবনে যথেষ্ট উন্নতি দেখা দেয়। জগতের আর্থিক সঙ্কট তাদের স্পর্শ করতে পারে না এবং সোভিয়েট ভূমিতে বেকার সমস্যা লোপ পায়। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনানুযায়ী কাজ আরম্ভ হবার পর দেখতে দেখতে সোভিয়েট গণজীবনে এতখানি অর্থনৈতিক পরিবর্তন আসে যে, তা অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের ঈর্ষার বস্তু হয়ে দাঁড়ায় এবং এই দুঃসহ অবস্থায় পড়ে তারা ক্রমশ বিপ্লবী সমাজতন্ত্রবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এতে সাম্রাজ্যবাদী শাসকগণ প্রমাদ গণেন এবং তাঁদের প্রাণে সোভিয়েট-আতঙ্ক উপস্থিত হয়। দলবদ্ধ হয়ে তাঁরা সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সব জঘন্য প্রচারকার্য চালাতে থাকেন এবং সোভিয়েট পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা যে উদ্ভট এবং তা যে ব্যর্থ হতে বাধ্য একথা প্রমাণের জন্য তাঁরা উঠে-পড়ে লেগে যান। য়ুরোপকে সোভিয়েট প্রভাব হতে মুক্ত করবার জন্য একটি য়ুরোপীয় সঙ্ঘ গঠনের সলাপরামর্শ চলে এবং তা নিয়ে জেনেভা ও অন্যান্য স্থানে বিস্তর আলোচনা হয়। ফ্রান্সের তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিব আরিষ্টাইড ব্রিয়ঁ। তাতে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। বলশেভিকবিদ্বেষ কতখানি প্রবল ছিল এইচ° জি° ওয়েলসের

একটি মন্তব্য হতেই তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি তাঁর পৃথিবীর ইতিহাসে বলেছেন :—

"সোভিয়েট রুশিয়ার বিরুদ্ধে জগতের সংবাদপত্রগুলিতে নিরঙ্কুশ ভাবে হীন প্রচারকার্য চলে এবং প্রচারকরা নানা ভাবে উর্বর মস্তিষ্কের পরিচয় দেন। তাঁদের চিত্রে বলশেভিক নেতারা লুণ্ঠনকারী ও রক্তপিপাসু দস্যু এবং তাঁরা কামুকতার এক একটি জীবন্ত মূর্তি"।

এর ওপর মন্তব্য বৃথা। কেবল প্রচারকার্য করেই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহের শাসকগণ ক্ষান্ত হন নি, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে 'ইণ্টারভেন্সনের' নামে তাঁরা একাধিকবার সামরিক অভিযান চালিয়েছেন।


সোভিয়েট পররাষ্ট্র সচিব মঃ মলোটফ

গত পঁচিশ বছরের ইতিহাসে সোভিয়েট শক্তির তিক্ত অভিজ্ঞতা যথেষ্টই সঞ্চিত রয়েছে। ১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দে মহাযুদ্ধের সময় রুশিয়ায় জারতন্ত্রের অবসানে সোভিয়েট শক্তি যখন নিরুপায় হয়ে আত্মরক্ষার জন্য ব্রেষ্ট-লিটভস্কে জার্মানীর সঙ্গে স্বতন্ত্র ভাবে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয় তখন চারদিক হতে তাকে বেড়াজালে ফেলে মারবার জন্য কম চেষ্টা করা হয় নি। ব্রেষ্ট-লিটভস্ক চুক্তিকে

তখন তথাকথিত গণতন্ত্রী মিত্রশক্তিবর্গ বিশ্বাসঘাতকতা বলে অভিহিত করে। তাদের অভিযোগ ছিল এই যে, জারশাসিত রুশিয়া মিত্রপক্ষের অর্থাৎ বৃটেন, ফ্রান্স প্রভৃতির পক্ষ হয়ে যুদ্ধে নেমেছিল ; সোভিয়েট গবর্ণমেন্টও সেই যুদ্ধ না চালিয়ে কেন জার্মানীর সঙ্গে সন্ধি করতে গেল ? অথচ সোভিয়েট গবর্ণমেন্টকে যে তখন বাস্তবের দিকে লক্ষ্য রেখে জার্মানীর সঙ্গে বাধ্য হয়ে সন্ধি করতে হয়েছিল—অর্থাৎ গৃহযুদ্ধের ফলে তার আর জার্মানীব বিরুদ্ধে লড়বার মত সামর্থ্য ছিল না—এ কথাটা মিত্রশক্তিবর্গ যেন বুঝেও বুঝছিল না। ব্রেষ্ট-লিটভস্ক চুক্তি যে একটা অজুহাত মাত্র বৃটিশ পার্লামেণ্টের সদস্য মিঃ ডি° এন° প্রিট তাঁর "Must the War Spread" নামক পুস্তকের এক স্থানে তা স্পষ্টভাবেই বলেছেন। তিনি লিখেছেন :—

"মিত্রশক্তিবর্গ বিশেষ জোর দিয়েই বলে যে, জারশাসিত রুশিয়ার সহিত তাদের যে সম্পর্ক ছিল, ব্রেষ্ট-লিটভস্ক চুক্তি দ্বারা তা ছিন্ন করা হয়েছে ; সুতরাং তাদের দূত মারফৎ তারা এতে তীব্র আপত্তি জানায়। এর অব্যবহিত পরই সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সহিত যে শত্রুতা আরম্ভ হয় এবং যা দীর্ঘকাল চলে, গত মহাযুদ্ধে মিত্রপক্ষের হয়ে সোভিয়েট রুশিয়ার না লড়াই যে তার প্রধান কারণ এ মনে করা ভুল। সোভিয়েট রুশিয়ার প্রতি বিরূপ হওয়ার এটাই যদি কারণ হয়ে থাকে তবে রুমানিয়ার প্রতিও মিত্রশক্তিবর্গের সেরূপ মনোভাব অবলম্বনই উচিত ছিল ; কারণ সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের মত রুমানিয়াও তখন মধ্য য়ুরোপীয় সাম্রাজ্য-শক্তিবর্গের সঙ্গে স্বতন্ত্র ভাবে এক শান্তির চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল।"

অতএব সোভিয়েট শক্তির ওপর খড়্গহস্ত হবার মূল কারণ ব্রেষ্ট-লিটভস্ক চুক্তি নয়, কম্যুনিষ্টবিদ্বেষ। ঘটনাচক্রে আজ যাঁরা নিতান্ত

সামরিক প্রয়োজনে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র তাঁদের মুখ দিয়ে সেদিনও সাম্যবাদের নিন্দা অকুণ্ঠে বেরিয়েছে। মিঃ চার্চিল, মিঃ ইডেন ও প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট স্পষ্টতই বলেছেন তাঁরা 'জঘন্য সাম্যবাদের' ঘোর বিরোধী। সে দিক দিয়ে বোধ হয় হিটলারের সঙ্গে তাঁদের কোন মতবিরোধ নেই। হিটলারের সঙ্গে তাঁদের একমাত্র পার্থক্য এই যে, হিটলার 'পররাজ্যলোভী—তাঁরা বলতে চান তাঁদের সেই 'লোভ' নেই।

আজ ফাসিস্ত শক্তির বিরুদ্ধে অনেক কথাই শুনতে পাওয়া যায়; কিন্তু গোড়ার দিকে একমাত্র সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রই বুঝতে পেরেছিল যে ফাসিস্ত শক্তির অভ্যুত্থানে কতখানি বিপদ আসতে পারে। তথাকথিত গণতন্ত্রী রাষ্ট্রসমূহের পুঁজিবাদী শাসকগণ তখন সোভিয়েট অভ্যুত্থানের আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে ফাসিস্ত অভ্যুত্থানকে গ্রাহ্যই করেন নি; বরঞ্চ অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা ফাসিস্ত নায়কদের প্রশ্রয়ই দিয়েছেন। 'ইণ্টারভেন্সন' নীতিতে ব্যর্থ হয়ে তাঁরা প্রকাশ্যে সোভিয়েট শক্তির বিরুদ্ধাচরণ ছেড়ে দিলেন সত্য, কিন্তু মনে প্রাণে তাকে গ্রহণ করতে পারলেন না। যখন দেখা গেল যে, নব বলে বলীয়ান বিপ্লবী সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রকে পর্যুদস্ত করা সহজ নয় তখন তাঁরা একে একে তার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে বাধ্য হলেন। বাইরে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে বাধ্য হলেও পুঁজিতন্ত্রীরা সাম্যবাদী সোভিয়েট শক্তির প্রতি মনে মনে বিদ্বেষের ভাবই পোষণ করতে লাগলেন এবং তার ফলেই য়ুরোপে তথা সমগ্র জগতে একটা শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা ফাসিস্ত শক্তির বিরোধিতায় সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কিছুতেই হাত মিলাতে পারলেন না। এই সোভিয়েটবিদ্বেষ যে কতখানি প্রবল ছিল, মিঃ ডি° এন° প্রিটের "Light on Moscow"

বই থেকে একটি উদাহরণ দিলেই তা বেশ বোঝা যাবে। তিনি লিখেছেন :—

"১৯২২ খৃষ্টাব্দে জেনোয়া নগরীতে এক সম্মেলন হয়। গত মহাযুদ্ধের ধ্বংসের পর কি ভাবে বিভিন্ন দেশকে পুনর্গঠিত করা যায় তা নিরূপণ করাই ছিল সম্মেলনের উদ্দেশ্য। য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিগণ তাতে উপস্থিত ছিলেন। তৎকালীন বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জ তাতে সভাপতিত্ব করেছিলেন। সম্মেলনের তরফ থেকে সোভিয়েট প্রতিনিধিদের বলা হল যে, তাঁরা যদি তাঁদের সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা পরিত্যাগ করে পুনরায় পুঁজিতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করতে সম্মত হন তবে মহাযুদ্ধে ও গৃহযুদ্ধে তাঁদের দেশের যে ধ্বংস হয়েছে তা পুনর্গঠনের জন্য তাঁরা সাহায্য পেতে পারেন। বলা বাহুল্য, সোভিয়েট প্রতিনিধিরা সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।"

আগাগোড়া গণতন্ত্রী দেশসমূহের শাসকবর্গের এই মনোভাব প্রবল ছিল বলেই রাষ্ট্রসঙ্ঘে সোভিয়েট প্রতিনিধি মঃ লিটভিনফ ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শত চেষ্টা করেও একটা ফাসিস্তবিরোধী সম্মিলিত দল সৃষ্টি করতে পারেন নি। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র রাষ্ট্রসঙ্ঘের বাইরেই ছিল। ১৯৩১-৩২ খৃষ্টাব্দে জাপান মাঞ্চুরিয়া দখলের পর সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব সীমান্তে একটা যুদ্ধোদ্যম করে এবং ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের বসন্ত কালে সে রাষ্ট্রসঙ্ঘ ছেড়ে দেয়। তারপর সেই বছরই শরৎকালে ফাসিস্ত জার্মানী রাষ্ট্রসঙ্ঘ পরিত্যাগ করে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের তখন দুই দিকে দুই শত্রু প্রবল হয়ে দাঁড়ায়— পূবে জাপান এবং পশ্চিমে জার্মানী। জার্মানীর অভ্যুত্থানে ফ্রান্সও খানিকটা চিন্তিত হয়ে পড়ে এবং সে তখন পারস্পরিক সাহায্যের

জন্য সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রকে রাষ্ট্রসঙ্ঘে যোগদানের নিমিত্ত আহ্বান করে। বলা বাহুল্য, বৃটেন ও ফ্রান্সই ছিল রাষ্ট্রসঙ্ঘের কর্ণধার। ফ্রান্স তখন বৃটেনের মিত্র; কাজেই সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্সের সেই আহ্বানকে বৃটেনেরও আহ্বান বলে ধরে নিল এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাহায্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটা শান্তি স্থাপিত হতে পারে এই আশায় সে রাষ্ট্রসঙ্ঘে যোগ দিল। কিন্তু রাষ্ট্রসঙ্ঘে এসে তাকে শেষ পর্যন্ত নিরাশ হতে হল। রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রহসন তার কাছে প্রথম স্পষ্টভাবে ধরা পড়ল মুসোলিনীর আবিসিনিয়া অভিযানের সময়। ইতালীর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক শাস্তিবিধানের প্রস্তাব গৃহীত হল; কিন্তু বৃটেন ও ফ্রান্স কার্যক্ষেত্রে তা প্রয়োগের সময় কোন সততার পরিচয় দিল না। তারপর স্পেনের গৃহযুদ্ধে বৃটেন ও ফ্রান্স "নন্‌ইণ্টারভেন্সনের" নামে হাত গুটিয়ে থেকে কার্যত ফাসিস্ত চক্রের শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করল।

হিটলার একদিকে ভার্সাই সন্ধির নিন্দা করে জার্মানদের মধ্যে বৃটেন ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার করেছেন, অপরদিকে কম্যুনিজম ধ্বংসের সুর তুলে পুঁজিতন্ত্রীদের চক্ষে ধূলি দিয়েছেন। পুঁজিতন্ত্রীরা হিটলারের এই ধাপ্পায় ভুলেই "তোষণনীতির" আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং সেজন্যই চরম সঙ্কটকালেও সোভিয়েট শক্তির সঙ্গে তাঁরা মস্কোতে সামরিক চুক্তির আলোচনায় নানারূপ গাফিলতি দেখিয়েছিলেন। হিটলার চতুর লোক; কাজেই সেই সুযোগ না ছেড়ে তিনি তাড়াতাড়ি সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একটা অনাক্রমণ চুক্তি করে সাময়িক ভাবে পূর্ব দিক সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হলেন এবং তারপরই পোলাণ্ডে অভিযান চালালেন। তথাকথিত গণতান্ত্রিক দেশগুলির পুঁজিবাদী শাসকগণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কাল পর্যন্ত সোভিয়েট

কর্তৃপক্ষকে কিছুতেই বুঝতে দেন নি যে, তাদের আসল উদ্দেশ্য কি। সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ তা স্পষ্টভাবে জানবার জন্য বহু চেষ্টা করেছেন, কিন্তু বারংবার তারা নিরাশ হয়েছেন। কোন সোভিয়েট প্রতিনিধিকে না ডেকে যেভাবে গোপনে মিউনিক চুক্তি করা হল তাতে তাঁরা গণতন্ত্রীদের সততা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আরও সন্দিহান হয়ে উঠলেন। হিটলার সোভিয়েট ভূমি আক্রমণ করলে গণতন্ত্রীরা যে তার সঙ্গে যোগ দেবেন না এমন কোন নিশ্চয়তা সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ পেলেন না। মিউনিক চুক্তির পরও তাঁরা ফ্রান্স এবং বৃটেনের সঙ্গে সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হতে চেয়েছিলেন এবং সেজন্য মস্কোতে আলোচনাও চালিয়েছিলেন; কিন্তু বৃটেন ও ফ্রান্সের তৎকালীন কর্ণধারগণ নানা চাল চেলে সেই আলোচনা ব্যর্থ করে দিলেন। এই অনিশ্চয়তার মধ্যে হিটলার যখন তাঁর পররাষ্ট্র সচিব ফন রিবেনট্রপকে এক অনাক্রমণ চুক্তির প্রস্তাব দিয়ে মস্কো পাঠালেন তখন সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ তা প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। তাঁরা জানতেন সে চুক্তি বেশিদিন স্থায়ী হবে না; বৃটেন ও ফ্রান্সের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে হিটলার কিছু শক্তি সঞ্চয় করেই সোভিয়েট ভূমি আক্রমণ করবেন; কেননা সোভিয়েট শক্তি বেঁচে থাকতে ফাসিস্ত শক্তি নিশ্চিন্ত হতে পারে না। গণতন্ত্রী পুঁজিবাদীদের সঙ্গে বরঞ্চ ফাসিস্তরা একটা রফা করে চলতে পারে; কিন্তু সমাজতন্ত্র ও ফাসিস্ততন্ত্রের মধ্যে মূলত এতই বিরোধ যে, তাদের পাশাপাশি এক সঙ্গে বেশী দূর চলা অসম্ভব। সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ এ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন বলেই হিটলারের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা আত্মরক্ষার আয়োজন বাড়িয়ে চলেছিলেন। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, নানাভাবে খেলে যে সাম্রাজ্যবাদীরা সোভিয়েট কর্তৃপক্ষকে হিটলারের সঙ্গে অনাক্রমণ

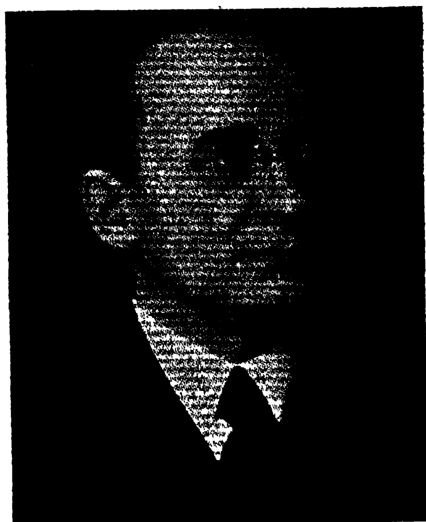
চুক্তিতে আবদ্ধ হতে বাধ্য করেছিলেন তাঁরাই চুক্তির পর সোভিয়েট শক্তি ফাসিস্ত সাম্রাজ্যের অংশীদার হয়েছে বলে তার নামে দুর্নাম রটাতে লাগলেন। অথচ ফাসিস্ত শক্তির অভ্যুত্থানকে তাঁরা আগাগোড়া কিরূপ অম্লান বদনে সহ্য করে আসছিলেন নিম্নের ঘটনাবলীই তার সাক্ষ্য দেবে।

হিটলারের অভ্যুত্থানের গোড়ার দিকে তাকালেই দেখা যায়, প্রথম হতেই তিনি কখনো পুঁজিবাদী কখনো সমাজতন্ত্রীদের সমর্থক হয়ে নিজের সুবিধা করে নেন এবং এভাবে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে জার্মানীর কর্তৃত্ব হস্তগত করে তিনি বৃহত্তর ক্ষেত্রে সেই নীতি প্রয়োগ করতে আরম্ভ করেন। পরের বছরই পূর্ব পার্শ্ব হতে আক্রমণ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হবার জন্য তিনি পোলাণ্ডের সঙ্গে দশ বছরের মেয়াদে এক শান্তি-চুক্তি করলেন। ভার্সাই সন্ধিতে জার্মানীর অস্ত্রবল সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে হিটলার তা অগ্রাহ্য করে অস্ত্রবল বাড়ালেন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে সামরিক বলে তিনি রাইনল্যাণ্ড দখল করলেন। সেই বছরই তিনি স্পেনের গৃহযুদ্ধে জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য করতে অগ্রসর হলেন। তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল স্পেনীয় প্রজাতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে পশ্চিম য়ুরোপে বৃটেন ও ফ্রান্সের একটি শত্রু সৃষ্টি করা। ফ্রাঙ্কোর জয়ের দ্বারা তাঁর সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে বলে তিনি যখন নিশ্চিন্ত হলেন তখন আবার তিনি পূর্ব দিকে মুখ ফেরালেন। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে তিনি অষ্ট্রিয়ায় অভিযান চালালেন। ফলে চেকো-শ্লোভাকিয়ার পার্শ্বদেশ বিপন্ন হল। গত মহাযুদ্ধের পর স্বপ্রভাবিত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহ সৃষ্টি করে ফ্রান্স জার্মানীর চারদিকে যে প্রাচীর খাড়া করেছিল, হিটলার কূটনৈতিক চালে তা ভেঙ্গে দিলেন। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মিউনিক চুক্তির দ্বারা তিনি যে কেবল সুদেতেনল্যাণ্ডই ফিরে পেলেন এমন নয়, চেকোশ্লোভাকিয়ার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিলেন।

তারপর ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে তিনি হৃতবল চেকোশ্লোভাকিয়াকে গ্রাস করে পোলাণ্ডের দক্ষিণ পার্শ্বদেশে বাহু বিস্তার করলেন। একরূপ বিনা রক্তপাতেই তিনি এতগুলি দেশে তাঁর তথাকথিত "শান্তি-অভিযান" চালিয়ে মধ্য য়ুরোপে ফরাসী আধিপত্য খর্ব করলেন। কেবল তাই নয়; চারদিকের প্রতিকূল বেষ্টনীকে তিনি কৌশলে অনুকূল করে নিলেন। একেই বলা যায় রণাঙ্গনে শত্রুকে ঘা দেবার আগে সুবিধাজনক স্থান অধিকার করে নেওয়া। এর দ্বারা প্রত্যক্ষ ভাবে জার্মানীর অস্ত্রবৃদ্ধির সুবিধা হয় এবং পরোক্ষভাবে তার শত্রুবর্গের শক্তি হ্রাস পায়; কেননা বৃটেন ও ফ্রান্স একে একে তাদের ক্ষুদ্র মিত্র শক্তিগুলিকে হারাতে থাকে। এভাবে হিটলার ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালের মধ্যে এমন অবস্থায় এসে পৌছলেন যে বার হতে সরাসরি আক্রান্ত হবার ভয় আর তাঁর রইল না। সেই সময় বৃটেন আর এক চাল দিতে গিয়ে ভুল করে বসল। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কোন বুঝাপড়া না করেই সে অকস্মাৎ পোলাণ্ড ও রুমানিয়াকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিল; অথচ উক্ত দুই দেশেই বৃটেন হতে সামরিক সাহায্য পাঠান কঠিন। একমাত্র সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বুঝাপড়া করলে সেখান হতেই পোলাণ্ড এবং রুমানিয়ায় সাহায্য প্রেরণ সম্ভব হত। কিন্তু তা না করে পোলাণ্ড ও রুমানিয়াকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় অবস্থা আরো খারাপের দিকে গেল। এই প্রতিশ্রুতির দ্বারা স্পষ্টত প্রকাশ পেল যে, বৃটেনের "তোষণনীতি" অনুসরণের আর অভিপ্রায় নেই। হিটলার তখন তাড়াতাড়ি সামরিক বলে পোলাণ্ড দখল করে পূর্ব দিকে সীমান্ত সম্প্রসারিত করলেন এবং তারপর পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ রূপে প্রস্তুত হলেন।

হিটলারের এই ষ্ট্র্যাটেজিক সম্প্রসারণের আসল উদ্দেশ্য মঃ ষ্ট্যালিন

বুঝতে পেরেছিলেন। মধ্য য়ুরোপেই হিটলারের সম্প্রসারণচেষ্টা সীমাবদ্ধ থাকবে না এবং তা যে এক ভাবী মহাসমরের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা মাত্র—একথা পূর্বাহ্ণে বুঝতে পেরেই মঃ ষ্ট্যালিন সেই ভাবী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন এবং তদুদ্দেশ্যেই তিনিও পশ্চিম দিকে সীমান্ত রেখা সরিয়ে দিলেন। হিটলার তাঁর চক্ষে ধূলি দিতে পারেন নি। মঃ ষ্ট্যালিন তখন পশ্চিম দিকে সোভিয়েট এলাকা না বাড়ালে হিটলারের বাহিনী আক্রমণের প্রথম চোটেই গিয়ে যে লেনিনগ্রাড ও মস্কোর দ্বারে উপনীত হত একথা পরে মঃ ষ্ট্যালিনের পরম শত্রুও স্বীকার করেছেন।


সোভিয়েট স্বরাষ্ট্র সচিব মঃ এল° বেরিয়া

সোভিয়েট ভূমিতে আক্রমণ চালাবার আগে হিটলার বৃটেনের মৈত্রী লাভের আশায় তাঁর অন্তরঙ্গ হের হেসকে বৃটেনে পাঠিয়ে আর এক চাল চেলেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, হের হেস অত্যন্ত সোভিয়েটবিদ্বেষী একথা বৃটেনের শাসকগণ জানেন; কাজেই সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মিলিত অভিযান চালাবার জন্য হেস হয়ত বৃটিশ শাসকগণের মৈত্রী লাভে সমর্থ হবেন। হের হেসকে নিয়ে বৃটেনে তখন নানারূপ জল্পনাকল্পনাও চলে। এমন কি কোন কোন সংবাদপত্রে তাঁর ব্যক্তিগত

প্রশংসাও করা হয়। অধ্যাপক প্যাট স্লোয়ান তাঁর "Russia Resists" নামক পুস্তকের এক স্থানে লিখেছেন :—

"হেস-সমর্থক প্রচারকার্যের বিরুদ্ধে জনসাধারণ তীব্র অসন্তোষ জানিয়ে সুর পরিবর্তনে বাধ্য না করলে মনে হয় সরকারী মহলে হেস হয়ত প্রকাশ্যেই সংবর্ধনা পেতেন।"

যে কারণেই হোক, হিটলারের সেই চাল ব্যর্থ হয়। মিঃ চার্চিল রুশ-জার্মান যুদ্ধ বাধার পর বেতারে ঘোষণা করেন :—

"যে কোন ব্যক্তি বা রাষ্ট্র নাৎসীশাসনের বিরুদ্ধে লড়বে সেই আমাদের সাহায্য পাবে।·· ···আমরা যতদূর পারি রুশিয়াকে সাহায্য করব।"

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে সামরিক চুক্তির আলোচনায় সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নানারূপ টালবাহনা করে বৃটেন যে ভুল করেছিল, হিটলারের এই চালে আর সে সেই ভুল করল না। হিটলারকে অগত্যা পশ্চাতে শত্রু রেখেই সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে অভিযান করতে হল। এই অভিযানে বাধা দেবার জন্য সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ পূর্বাহ্নে কতখানি প্রস্তুত হয়েছিলেন এবার সংক্ষেপে তাই বলব।

সমরসামর্থ্য

সোভিয়েট সমরপ্রস্তুতি বুঝতে হলে বিভিন্ন দেশের সমরায়োজনের গোড়ার কথা কিছু জানা দরকার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধার পূর্বে য়ুরোপের রাজনৈতিক গগনে যে প্রবল ঝড় ওঠে তার মূলে ছিল নতুন সামরিক শক্তির আবির্ভাব। নাৎসী জার্মানী এবং সাম্যবাদী সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র সম্পূর্ণ নতুন ধরণে সমরসজ্জা করে;

সমরায়োজনে প্রাচীনপন্থী গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্স হতে তা একেবারেই পৃথক। প্রয়োজনকালে অনতিবিলম্বে যাতে দেশের সমস্ত শক্তিসামর্থ্য ও সম্পদরাশি সামরিক প্রয়োজনে নিয়োজিত করা চলে, জার্মানী ও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র পূর্বাহ্নেই তেমন ব্যবস্থা করে রাখে এবং উভয় দেশই রণকৌশলকে আক্রমণাত্মক করে তোলে। পক্ষান্তরে গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্স সেই প্রাচীন আত্মরক্ষাত্মক রণকৌশলকেই আঁকড়ে ধরে বসে থাকে। ফলে ভার্সাই সন্ধিতে গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্স সামরিক বলে যে প্রাধান্য লাভ করেছিল, ১৯৩০ হতে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তা লোপ পায় এবং পশ্চিম য়ুরোপের সামরিক প্রাধান্য মধ্য ও পূর্ব য়ুরোপে এসে আশ্রয় নেয়।

নাৎসী জার্মানী ও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র এই দুই নতুন সামরিক শক্তির রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পৃথক; কাজেই তাদের সমরায়োজনের লক্ষ্যও স্বতন্ত্র। অস্ত্র বাড়ালেই পররাজ্য গ্রাস করতে হবে এমন কোন কথা নেই। আক্রমণাত্মক সমরপ্রস্তুতি আর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে পররাজ্য আক্রমণ এক কথা নয়। সামরিক ক্ষেত্রে আক্রমণাত্মক নীতি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সহজেই আত্মরক্ষাত্মক অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হতে পারে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্রবৃদ্ধির উদ্দেশ্য তার রাজনৈতিক লক্ষ্যকে বাঁচিয়ে রাখা; নাৎসী জার্মানীর মত পররাজ্যমুখী নয়। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দৃষ্টিপাত করলেই তার প্রমাণ মেলে। চারদিক থেকেই আক্রান্ত হবার একটা আশঙ্কা যে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের ছিল সোভিয়েট পররাষ্ট্র প্রসঙ্গে তা আলোচনা করেছি।

নাৎসী জার্মানী ও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সমরপ্রস্তুতিতে তিনটি বিষয় বিশেষ ভাবে বিবেচ্য।

প্রথমত, তাদের প্রাকৃতিক ও সামগ্রিক সম্পদ বেশী; য়ুরোপে সব

চেয়ে বেশী লোকের বাস ওই দুই দেশে এবং তাদের প্রত্যেকেরই শৈল্পিক সামর্থ্য যথেষ্ট।

দ্বিতীয়ত, সমরসম্ভার নির্মাণে তারা যথেষ্ট সময় থাকতে মন দেয় এবং তাদের অস্ত্রগুলি অতি আধুনিক ও উৎকৃষ্ট সেনাদল গঠনে যান্ত্রিক উৎকর্ষের কোনটিকেই তারা বাদ দেয় না।

তৃতীয়ত, জার্মানী ও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে আদর্শ পৃথক হলেও রাষ্ট্র কর্তৃক শিল্পোৎপাদন নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় বৈপ্লবিক পন্থায় সেনাগঠনে সুবিধা হয়েছে। রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত শিল্পসম্পদকে তারা যেমন পূর্বাহ্ণেই সমরার্থক করে তুলতে পেরেছে, তথাকথিত গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদী গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্স তেমন পারে নি। শিল্পকে সমরার্থক করার জন্য যুদ্ধ বাধার পর সমস্ত কলকারখানা বৃটিশ সরকারকে নিজ নিয়ন্ত্রণে নিতে হয়; কিন্তু জার্মানী ও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র এব্যবস্থা পূর্ব হতেই করে রেখেছিল। কাজেই প্রয়োজন হওয়ামাত্রই তারা দেশের সমস্ত শক্তি ও সম্পদ যুদ্ধে নিয়োজিত করতে পেরেছে। এই কারণেই তাদের সমরসামর্থ্য অধিক।

সামরিক শক্তিপুঞ্জের মধ্যে নাৎসী জার্মানী ও সাম্যবাদী সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের স্থান যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধার প্রাক্কাল পর্যন্ত শীর্ষে ছিল তা অবিসংবাদিত সত্য; কারণ অর্থনৈতিক শক্তিসম্পন্ন দেশগুলির মধ্যে কেবল এই দুই দেশই সমরসামর্থ্য বাড়াবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। হিটলার কর্তৃক অন্যান্য দেশ দখলের আগে আবার এই দুই দেশের মধ্যে বোধ হয় সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের স্থান আরও উচ্চে ছিল, কেননা জার্মানীর তুলনায় তার কাঁচা মাল ও জনবল ছিল বেশী।

এই গেল প্রথম শ্রেণীর সামরিক শক্তির কথা। দ্বিতীয় শ্রেণীর পর্যায়ে পড়ে গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্স। এই দুই দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি খুবই

পোলাণ্ড, রুমানিয়া ও যুগোশ্লাভিয়াকে। শিল্পক্ষেত্রে তারা নিতান্তই অনগ্রসর, সৈন্যবল মাঝারি, অস্ত্রশস্ত্র খুবই কম। কাজেই দলে ভিড়াবার জন্য তাদের নিয়ে প্রবল রাষ্ট্রসমূহ যথেষ্টই টানা হেঁচড়া করে। তাদেব মধ্যে পোলাণ্ড ও যুগোশ্লাভিয়ার সামরিক বল জার্মানীব সঙ্গে যুদ্ধে বিনষ্ট হয় এবং রুমানিয়া জার্মানীব দলে ভিড়ে পড়ে।

এই মানদণ্ডের সাহায্যে বিচার কবলে সহজেই অনুমান করা যায় সামরিক জগতে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের স্থান কোথায়। রুশ-জার্মান যুদ্ধ বাধার পর সোভিয়েট সামরিক শক্তির পবিচয় পেয়ে অনেকেই বিস্মিত হন ; কিন্তু সামবিক জগতেব যথার্থ খবর যারা রাখতেন তাঁরা তাতে মোটেই বিস্মিত হন নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধার আগেই সোভিয়েট সমরপ্রস্তুতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ব্যক্তিরা যেসব কথা বলেছিলেন এবার সেইগুলি নিয়েই আলোচনা করব।

প্রথমেই বলা দরকার, যুদ্ধে যথেষ্ট জনবল ও প্রচুর কাঁচা মালের প্রয়োজন। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে তার অভাব নেই। কাজেই জনবল ও কাঁচামাল যথেষ্ট থাকায় সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রেব সামরিক ভিত্তি দৃঢ় এবং দীর্ঘকাল যুদ্ধ চালাতে সে সক্ষম। সোভিয়েট প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার ফলেই তার সামরিক জীবনে এমন আমূল পবিবর্তন আসে যার ফলে সমগ্র য়ুরোপের পারস্পরিক সামরিক সম্পর্ক বদলে যায়।

অবশ্য অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় হলেই যে কোন দেশ সামরিক বলে শ্রেষ্ঠ হবে এমন ধারণা করা ভুল ; কাবণ বৃটেন ও ফ্রান্সের অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় থাকা সত্ত্বেও সমরায়োজনের দিক দিয়ে তারা জার্মানীর পশ্চাতে পড়ে ছিল। কাজেই যুদ্ধের জন্য চাই প্রস্তুতি। যুদ্ধে সমস্ত শক্তি ও সম্পদ নিয়োগের জন্য পূর্বাহ্ণে প্রস্তুত হয়ে না থাকলে শত আর্থিক স্বচ্ছলতা এবং প্রচুর জনবল নিয়েও পরে সহজে কিছু করে ওঠা

যায় না। আধুনিক যুদ্ধে প্রথম দিকেই প্রয়োজন হয় যথেষ্ট সুশিক্ষিত



লাল ফৌজের একজন নারী এঞ্জিনিয়ার তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে আলাপ করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে নামছেন।

সৈনিক এবং প্রচুর সমরোপকরণ। যুদ্ধের প্রারম্ভেই যথাসাধ্য শক্তি

নিয়োজিত করতে না পারলে যুদ্ধের সময় শক্তিসঞ্চয় করা কঠিন হয়ে পড়ে। বর্তমান যুদ্ধের মুখে সামরিক বলে দুর্বল থেকেও বৃটেন যে পরে কিছুটা শক্তিসঞ্চয় করার অবসর পেয়েছে তা তার সুবিধাজনক ভৌগোলিক অবস্থানের জন্যই সম্ভব হয়েছে। কিন্তু বৃটেনের পক্ষে যা সম্ভব হয়েছে ফ্রান্সের পক্ষে তা হয় নি। অতি অল্পকালের মধ্যেই ফ্রান্সের পতন ঘটেছে। গত মহাযুদ্ধেও কিন্তু সমরসম্ভার বৃদ্ধির প্রচুর সুযোগ এবং অবসর যুধ্যমান রাষ্ট্রগুলি পেয়েছিল; কারণ ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ বাধলেও যথার্থ শক্তিশালী কামান, গোলা ও এরোপ্লেনের ব্যাপক ব্যবহার আরম্ভ হয়েছিল ১৯১৭-১৮ খৃষ্টাব্দে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে একশত ডিভিসন জার্মান সেনার ২৫ শতের বেশী মেশিনগান ছিল না—আজকাল পাঁচ ডিভিসন জার্মান সেনারই প্রায় তত সংখ্যক মেশিনগান থাকে। কাজেই তখনকার তুলনায় আজকাল অবস্থার অনেকখানি পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানকালে জরুরী অবস্থার জন্য দেশের সমস্ত শক্তি ও সম্পদকে সমরার্থক করে না রাখলে যুদ্ধকালে শক্তিসঞ্চয়ের অবসর তেমন ঘটে না। অতএব সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সমরপ্রস্তুতির কথা বিচার করলে দেখতে হবে গত কয় বছরে তার সমরায়োজন কি ভিত্তিতে হয়েছে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট সমরবিশেষজ্ঞ মিরেৎশিনের অভিমত এখানে সর্বাগ্রে গ্রাহ্য। তিনি বলেছেন:—

"আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রগুলিকে অবিলম্বে যুদ্ধে প্রেরণ করতে হয় এবং সেগুলি সংখ্যায় প্রচুর হওয়া দরকার। অস্ত্রগুলি এমন শক্তির আধার যা ছোট ছোট কিস্তিতে খরচ করলে চলবে না। অতএব যুদ্ধে 'ব্যয়সঙ্কোচ' বা পরীক্ষা করে দেখার অবসর নেই।"

বলা বাহুল্য, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের আধুনিক সামরিক শক্তি এই নীতিকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। জার্মানীর ন্যায় সেও যুদ্ধের

সময় যাতে অনতিবিলম্বে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করতে পারে পূর্বাহ্নেই তেমন ব্যবস্থা সে করে রাখে। সমরায়োজনও সে জার্মানীর পূর্বেই আরম্ভ করে। তার মত রিজার্ভ সৈন্য য়ুরোপের আর কোন রাষ্ট্রেরই ছিল না। কেউ কেউ বলেছিলেন যে তার সুশিক্ষিত রিজার্ভ সৈন্যের সংখ্যা প্রায় ২ কোটি এবং তাদের অধিকাংশই অতি আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র চালনায় সুনিপুণ। য়ুরোপে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের মত সামরিক সম্পদরাশিও আর কারো নেই। তার উন্নত প্রণালীর শিল্পব্যবস্থা, উৎকৃষ্ট সমরশিল্প এবং সুপরিচালিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সবই যুদ্ধের অনুকূল। এই সমস্তে মিলে যে সে যুদ্ধশক্তিতে একটা বিশিষ্ট স্থান লাভ করে—শত্রুমিত্র অনেকের মুখেই তা প্রকাশ পায়।

ফ্রান্সের রক্ষণশীল দলের অন্যতম মুখপত্র "Revue des Deux Mondes"তে এক সময় লেখা হয় :—

"য়ুরোপের শক্তিবর্গের মধ্যে সামরিক সম্পর্ক নিরূপণ করতে হলে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বল অবশ্য ধর্তব্য।"

উপরোক্ত পত্রিকাখানিতে মার্শাল পেতাঁ, জেনারেল ওয়েগাঁ, জেনারেল দেবেলী প্রভৃতি ফ্রান্সের বিশিষ্ট সমরবিশারদগণ লিখতেন। কাজেই সে পত্রিকার মতামত হেসে উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দে জাপ নৌদপ্তরের মুখপত্র "ইয়েস্থ"তে জাপ নৌবিভাগীয় প্রতিনিধি মিঃ মেহ্দী লিখেন :—

"সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের কেবল যথেষ্ট সংখ্যক ট্যাঙ্ক আছে বললেই হয় না—তার বৈশিষ্ট্য এই যে, সেইগুলির অধিকাংশই আধুনিক ধরণের ট্যাঙ্ক। সামরিক কুচকাওয়াজে যেসকল বিদেশী প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন লাল ফৌজের যন্ত্রসজ্জা তাঁদের তাক লাগিয়ে দেয়।"

শুধু তাই নয়। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে বিশিষ্ট সমরবিশেষজ্ঞ জেনারেল ব্যারেট্রিয়ার "টেম্পস্" পত্রিকায় লিখেন :—

"যুদ্ধের জন্য ডাক পড়লে লাল ফৌজ যুদ্ধজয়ের পক্ষে একটি শক্তিশালী অস্ত্ররূপে আত্মপরিচয় দিবে। লাল ফৌজের মত এমন যন্ত্রসজ্জা য়ুরোপের আর কোন শ্রেষ্ঠ সেনাদলেই নেই।"

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে লাল ফৌজের যে যন্ত্রসজ্জা আরম্ভ হয়, সোভিয়েট সমরনায়ক মার্শাল ভরোশিলফ ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে তা কোথায় এনে ঠেকান, সামরিক ব্যয়বৃদ্ধির হিসাব দেখেই তা অনেকটা অনুমান করা যায়। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে যেখানে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ব্যয়বরাদ্দ ছিল ১.৫ মিলিয়ার্ড রুবল, ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে সেখানে তার সামরিক ব্যয়বরাদ্দ এসে দাঁড়ায় ৩৪ মিলিয়ার্ড রুবলে অর্থাৎ ৬ বছরে তার সামরিক ব্যয় ২২ গুণ বেড়ে যায়।* ১৯৩১—৩৪ খৃষ্টাব্দে সে সামরিক প্রয়োজনে মোট খরচ করে ৯ মিলিয়ার্ড রুবল—আর ১৯৩৫ হতে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দ এই চার বছরে সে একই প্রয়োজনে মোট খরচ করে ৭৯ মিলিয়ার্ড রুবল। এ হতেই বোঝা যায়, গত কয় বছরে তার সামরিক বল কিরূপ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়। জার্মানীও পূর্ণোদ্যমে সমরায়োজনে মন দেয় ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে। কাজেই দেখা যায়, জার্মানীর সঙ্গে পাল্লা দিয়েই সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র তার সমরোপকরণ বৃদ্ধি করেছে। বৃটেন ও ফ্রান্সের মত গড়িমসি চালে চলে সে পশ্চাতে পড়ে থাকে নি। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে মার্শাল ভরোশিলফ ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের তুলনায় লাল ফৌজের সৈন্য ও অস্ত্রবল বৃদ্ধির যে অনুপাত দেন তা এইরূপ :—

সৈন্য শতকরা ১০৩; ট্যাঙ্ক শতকরা ১৯১; সাঁজোয়া গাড়ী

* [illegible] ৩ রুবল আমাদের দেশের প্রায় ৫ টাকার সমান। অন্যত্র ৩৬ পৃষ্ঠায় ১ রুবল ৩ টাকার সমান [illegible] হয়েছে।

শতকরা ৬৫০ ; গোলাগুলী শতকরা ৪০০ ; বড় কামান শতকরা ৮৫ এবং বিমানধ্বংসী কামান শতকরা ১৬৯।

কেবল তাই নয়। সঙ্গে সঙ্গে সামরিক অফিসারের সংখ্যাও বাড়ান হয়। অফিসার বৃদ্ধির অনুপাত এই :—

পদাতিক বাহিনীর সেনানী শতকরা ১১৮ ; অশ্বারোহী দলের সেনানী শতকরা ৬৬ ; সাঁজোয়া বাহিনীর সেনানী শতকরা ১৫৪ এবং গোলন্দাজ বাহিনীর সেনানী শতকরা ১২৫। কমিশনবিহীন অফিসারের সংখ্যা দ্বিগুণ, ক্ষেত্র বিশেষে তিন গুণও করা হয়।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র একদিকে যেমন সুশিক্ষিত সৈন্য ও সেনানীর সংখ্যা বাড়িয়েছে, অপরদিকে তেমনি প্রচুর পরিমাণে মারণাস্ত্র নির্মাণ করেছে। কারণ অস্ত্র না থাকলে সৈন্য বাড়িয়ে কোন লাভ নেই। ম্যাক্স বার্নার তাঁর "The Military Strength of the Powers" নামক পুস্তকে লিখেন :—

"আমরা ধরে নিতে পারি যে, ১৯৩৫—৩৮ খৃষ্টাব্দে লাল ফৌজ তার আধুনিক মারণাস্ত্রের সংখ্যা দ্বিগুণ করেছে। ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে তার বিমানসংখ্যা ১০ হাজার এবং ট্যাঙ্কের সংখ্যা ১৫ হাজার হতে ২০ হাজারের মধ্যে এসে দাঁড়ায়।"

১৯৩৫—৩৬ খৃষ্টাব্দেই সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে সামরিক উদ্দেশ্যে দেড় লক্ষ বৈমানিক ও ৯ লক্ষ মোটরচালক শিক্ষিত করে তোলা হয়। এছাড়া সোভিয়েট কৃষকদের অধিকাংশই চাষের জন্য ট্র্যাক্টর চালনায় অভ্যস্ত। কাজেই তাদের পক্ষে ট্যাঙ্কচালনা শিখতে বেশীদিন লাগার কথা নয়।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের হিসাবেই দেখা যায়, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে বিমান নির্মাণের বড় কারখানা বার তেরটি রয়েছে ; তন্মধ্যে ছ'টি

কারখানায়ই বছরে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রায় পাঁচ হাজার বিমান নির্মিত হতে পারে। কারখানাগুলিতে তখনই আড়াই লক্ষ লোক কাজ করছিল। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের পর সেই সব কারখানা সম্প্রসারিত এবং আরো অনেকগুলি নতুন কারখানা স্থাপিত হয়।

তারপর জার্মানী কখনো আক্রমণ করলে তা প্রতিরোধের এবং পাল্টা আক্রমণের ব্যবস্থাও সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ তাঁদের পশ্চিম সীমান্তে ভালভাবেই করে রাখেন। ম্যাক্স বার্নার তাঁর পূর্বোক্ত পুস্তকে লিখেন :—

"১৯৩৫—৩৮ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের যে সামরিক প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ করে তার ফলে তার পশ্চিম সীমান্তে দ্রুত পাল্টা ঘা দেওয়ার উপযোগী একটি শক্তিশালী ও ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন সেনাদল গড়ে ওঠে।"

কি অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়, কি শৈল্পিক প্রচেষ্টায়, সর্বক্ষেত্রেই সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র সমরশিল্পকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়ে আসে। আত্মরক্ষার প্রচেষ্টায় সে কখনো গাফিলতি করে নি। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের একখানি শ্রেষ্ঠ অর্থনৈতিক পত্রিকায় লেখা হয় :—

"আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক পদ্ধতির এমন সব শাখা, বিশেষত আমাদের সমরশিল্পের দ্রুত উন্নতির দিকে এমন ভাবে মন দিতে হবে যার ফলে আমাদের দেশরক্ষার ব্যবস্থা অধিকতর সুদৃঢ় হয়ে ওঠে এবং যুদ্ধের সময় আমাদের আর্থিক ব্যবস্থা অবিচলিত থাকে। শিল্পসম্পদ বৃদ্ধির অর্থও হল সমরশিল্পের উন্নতি।"

তারপর ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে জার্মান সমরদপ্তরের মুখপত্র "Borsen—Zeitung" পত্রিকায় লেখা হয় :—

"সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি পরিচালনায় সামরিক প্রয়োজন

অপ্রয়োজনের কথাই বিশেষভাবে বিবেচিত হয়।......শান্তির সময় সামরিক প্রযোজন সাধন এবং যুদ্ধকালে বর্ধিত সামরিক চাহিদা পূরণের জন্য সমগ্রভাবে শিল্পকে প্রস্তুতকরণই হল সোভিয়েট অর্থনৈতিক পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য।”

অতএব দেখা যায়, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র বিপদের সম্মুখীন হওয়ার জন্য বহুদিন হতেই প্রস্তুত হয়ে আসছিল। শিল্পোন্নয়ন করতে গিয়ে সে কেবল বিলাসের সামগ্রীই প্রস্তুত করে নি—সঙ্গে সঙ্গে আত্মরক্ষার জন্য প্রচুর পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্রও নির্মাণ করেছে এবং তার অস্ত্রের উৎকর্ষ ও কার্যকারিতার সাক্ষাৎ পরিচয় যাঁরা পেয়েছেন তাঁরা অকুণ্ঠভাবে তার প্রশংসা না করে থাকতে পারেন নি। সমরবিজ্ঞানে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র যে কোন কোন ব্যাপারে নাৎসী জার্মানীর পথপ্রদর্শক তারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

অস্ত্রবিদ্যা

সাম্যবাদী সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের একথা গোড়া হতেই ভাল ভাবে জানা ছিল যে, কেবল জার্মানী কেন, একদিন জগতের সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিপন্থী সমস্ত রাষ্ট্র মিলেই তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে। কাজেই সেই সম্মিলিত বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে লড়বার উপযোগী করেই সে যতদূর সম্ভব আত্মরক্ষার আয়োজন করে এবং সেভাবেই সামরিক সামর্থ্য লাভে সে প্রয়াস পায়। তবে তার প্রতিবেশী রাষ্ট্র জার্মানী আধুনিক রণসজ্জা ও রণকৌশলে যে সমগ্র জগৎকে ছাড়িয়ে যেতে চেষ্টিত তা সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র প্রথম হতেই লক্ষ্য করেছে এবং সেজন্যই সে গত কয় বছরে নিজের সামরিক ব্যবস্থাতেও বিপ্লব আনয়নের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে।

কোন দেশের রণনৈপুণ্যের কথা বলতে গেলেই প্রথমে বলতে হয় সেই দেশের সৈন্তরা আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র চালনায় অভ্যস্ত কিনা। অতএব লাল ফৌজ এদিক দিয়ে কতদূর কি শিক্ষা পায় তা আমাদের দেখা দরকার। আধুনিক ফৌজকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করে দেখলে মন্দ হয় না—সাবেক ও নতুন। পদাতিক ও অশ্বারোহীকে সাবেক ধরণের এবং ট্যাঙ্ক ও বিমান বাহিনীকে নতুন ধরণের ফৌজ বলা যেতে পারে। গোলন্দাজ বাহিনীকে এই দুই শ্রেণীর মাঝামাঝি পর্যায়ভুক্ত করা চলে। অবশ্য এই সীমারেখাকে সর্বত্র রক্ষা করা চলে না; কারণ তথাকথিত সাবেক শ্রেণীর ফৌজকে আজকাল নানাভাবে এতখানি আধুনিক করা হয়েছে যে, তাকে পুরাতন বললে ভুল হয়। এই রূপান্তর সাধনে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের কৃতিত্বের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সে কয়েক বছর পূর্বেই তার পদাতিক বাহিনীকে এমন ভাবে পুনর্গঠিত করে যাতে তারা সকল প্রকার আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রেরই সাহায্য পেতে পারে। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দেই তার পদাতিক বাহিনীর এক তৃতীয়াংশকে সে মোটরসজ্জিত করে এবং তা সমগ্র বাহিনীর যন্ত্রসজ্জার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়। এতদ্ব্যতীত ট্যাঙ্কবহরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে যাতে যুদ্ধ করা সম্ভব হয়, এই এক তৃতীয়াংশ পদাতিক বাহিনীকে তেমন ভাবে গড়ে তুলতেও লাল ফৌজের কর্তারা কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নি। এতদ্ব্যতীত দুই তৃতীয়াংশ পদাতিক বাহিনীর নিজস্ব ট্যাঙ্কের ব্যবস্থা করা হয়। লাল ফৌজের পদাতিক বাহিনী সম্বন্ধে এক সময় ফরাসী সেনাপতিমণ্ডলীর অধ্যক্ষ জেনারেল ভাইসগাঁ বলেন :—

"আমরা সাহসী সোভিয়েট পদাতিক সৈন্তদের অতি দ্রুত গতিতে ছুটে গিয়ে দুর্গম অঞ্চলে আক্রমণ চালাতে এবং অত্যন্ত অল্প

সময়ের মধ্যে পরিখা খনন করে তাতে তাদের আশ্রয় নিতে দেখেছি।"

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে লাল ফৌজের পদাতিক বাহিনীর মহড়া দেখে চেক সামরিক মিশনের নায়ক জেনারেল লুজাও বলেন :—

"মহড়ায় দেখলাম সোভিয়েট পদাতিক সৈন্যরা বেশ তৎপরতার সঙ্গে ঘোরাফেরা করল এবং অস্ত্রচালনায় চমৎকার নৈপুণ্যের পরিচয় দিল।"

এই গেল সেনাসংগঠনের কথা। অস্ত্র চালনায়ও যে সোভিয়েট সেনা সুনিপুণ তারও পরিচয় আগেই পাওয়া যায়। ম্যাক্স বার্নার ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে তাঁর "The Military Strength of the Powers" নামক বিখ্যাত পুস্তকে লিখেন :—

"১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে লণ্ডনে যে আন্তর্জাতিক 'স্মল-ক্যালিবার' গুলীবর্ষণ প্রতিযোগিতা হয় তাতে ২৮টি দেশ হতে ২১২টি প্রতিযোগী দল যোগ দেয়; তন্মধ্যে সোভিয়েট দল শীর্ষস্থান অধিকার করে এবং ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে সেই একই প্রতি-যোগিতায় তারা প্রথম হতে ষষ্ঠ স্থান পর্যন্ত লাভ করে। এ থেকেই বোঝা যায় গুলীবর্ষণে তারা কিরূপ নিপুণ। দীর্ঘ পথ 'মার্চ' করে যেতেও তারা অভ্যস্ত। তাদের কষ্টসহিষ্ণুতা সম্বন্ধেও শত্রুমিত্র অনেকেই প্রশংসা করেন। শুধু তাই নয়, লাল ফৌজে এমন সব বৈমানিক আছেন যাঁরা সাত হাজারেরও অধিকবার আকাশে উড়ে ছয় লক্ষাধিক মাইল পথ অতিক্রম করেছেন। এমন সব ট্যাঙ্কচালক আছেন যাঁদের আড়াই হাজার ঘণ্টা ট্যাঙ্ক চালাবার অভিজ্ঞতা আছে। এমন সব ট্যাঙ্ক আছে যেগুলি চার হাজার মাইল পথ ভ্রমণ করেছে এবং একাদিক্রমে ৯০০ মাইল অতিক্রম করতে কোন

যান্ত্রিক গোলমাল হয় নি। এতদ্ব্যতীত এমন আরও বহু ট্যাঙ্ক আছে যেগুলি জলকাদা ভেঙ্গে ৩০০ মাইল পথ অতিক্রমে সক্ষম হয়েছে এবং সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের উভচর ট্যাঙ্ক জলে স্রোত ঠেলে সাত ঘণ্টা পর্যন্ত পথ চলেছে।"

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে মার্শাল ভরোশিলফ এক বক্তৃতায় বলেন :—

"উদ্ভাবনী শক্তিকে ধন্যবাদ। আরো ধন্যবাদ যেসকল যান্ত্রিক ও সেনানী এই সকল যন্ত্রের সাহায্যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। আমাদের ট্যাঙ্কচালকগণ অনায়াসে তাঁদের ট্যাঙ্কগুলিকে জলাভূমি দিয়ে সাফল্যের সহিত চালিয়ে নিয়ে গিয়েছেন, অথচ সেগুলি জলাভূমিতে চালাবার জন্য মোটেই তৈরী হয়েছিল না। তাঁরা উভচর ট্যাঙ্ক নিয়ে নদী, হ্রদ, এমন কি ছোটখাট উপসাগর পর্যন্ত পার হয়েছেন। এমন সুদক্ষ ট্যাঙ্কচালক আমাদের বহু রয়েছেন।"

মার্শাল ভরোশিলফ যা বলেন, চেক সমরবিশারদ জেনারেল লুজা, ফরাসী সেনানীমণ্ডলীর অধ্যক্ষ জেনারেল ভাইসগথ এবং বৃটিশ সেনানায়ক কর্ণেল মার্টেলের উক্তিতেও তারই সমর্থন পাওয়া যায়। তাঁরা সকলেই একবাক্যে সোভিয়েট ট্যাঙ্কবাহিনীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

তারপর সোভিয়েট বিমানসেনাও নানাভাবে সুশিক্ষিত হয়ে ওঠে। সাহসে, সহিষ্ণুতায়, যান্ত্রিক নৈপুণ্যে এবং পর্যটনকৌশলে তাদের খ্যাতি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। সুমেরু অঞ্চল অভিযানে সোভিয়েট বৈমানিকগণ যে অসম সাহস ও নৈপুণ্যের পরিচয় দেয় সেকথা কে না জানে? জগতের বিভিন্ন বিমান প্রতিযোগিতায়ও সোভিয়েট বৈমানিকগণের যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। সুমেরু অঞ্চল জয়ের সঙ্গে সোভিয়েট দেশরক্ষার যোগাযোগ যথেষ্টই রয়েছে। মেরু

অঞ্চল গত কয়েক বছর রুশ বৈমানিকদের একটি প্রধান শিক্ষাস্থল হয়ে ওঠে। সাইবেরিয়ার ওপর দিয়ে হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করা এবং উত্তর মহাসাগরের ঝড়বায়ুর মধ্য দিয়ে বিমানচালনা যাদের পক্ষে সহজসাধ্য হয়ে ওঠে, বলা বাহুল্য, য়ুরোপের যে কোন আবহাওয়ায়ই তারা বিমানচালনায় সক্ষম। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে এই



সোভিয়েট উভচর ট্যাঙ্ক। স্থলে ও জলে এই ট্যাঙ্ক সমভাবেই চলতে পারে।

মেরু-অভিযান সম্পর্কে সোভিয়েট দেশরক্ষা বিভাগের একখানি মুখপত্রে লেখা হয়:—

"সুমেরু অঞ্চল জয় করে আমরা আমাদের দেশরক্ষা-ব্যবস্থা সুদৃঢ় করছি।"

বিমানবিদ্যার প্রতি জনসাধারণকে অনুরাগী করার জন্য সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ আপ্রাণ চেষ্টা করে এবং সেখানে অসংখ্য নারী বৈমানিক

রয়েছে। এমন কি শিশুদের খেলনাগুলি পর্য্যন্ত নানা মডেলের বিমানাকারে প্রস্তুত হয়। কাজেই শৈশব হতেই সেখানে বিমান সম্বন্ধে লোকের মনে আগ্রহ জাগে। নানা প্রকার বিমান ক্লাব স্থাপন, গ্লাইডার চালনা, প্যারাশুটে অবতরণ শিক্ষাদান প্রভৃতি নানাভাবেই সেখানে বিমানবিদ্যা সম্প্রসারিত করা হয়। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েট সরকার তাদের সঙ্কল্প ঘোষণা করেন যে, অন্তত দেড় লক্ষ সমরক্ষম বৈমানিক শিক্ষিত করে তুলতে হবে। তাতেই বোঝা যায়, সেখানে বিমানবল সৃষ্টির জন্য কিরূপ চেষ্টা করা হয়। জার্মান বিমানদপ্তরের মুখপত্রে কর্ণেল ফন বুলাও ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে লিখেন :—

"সম্প্রতি কয়েক বছরে সোভিয়েট রুশিয়ার বিমানবল এত বাড়ান হয়েছে যে জগতে তার সমকক্ষ কেউ নেই। বিমানবলই সোভিয়েট রুশিয়ার সামরিক শক্তির প্রাণকেন্দ্র।"

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের পরও যে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ পূর্ণোদ্যমেই সমরায়োজন করেছেন সেকথা আগেই বলেছি। কাজেই বিমানবলে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র জার্মানীর তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী না হলেও যে রুশ-জার্মান যুদ্ধের আগেই তার সমকক্ষ হয় তা একরূপ নিঃসন্দেহেই বলা চলে। রুশ-জার্মান যুদ্ধ বাধার অব্যবহিত পর বৃটিশ বিমানবিশেষজ্ঞ মেজর অলিভার স্টুয়ার্ট এক বেতার বক্তৃতায় বলেন :—

"জার্মানরা যান্ত্রিক নৈপুণ্যের দিকে অত্যধিক জোর দেয় একথা সত্য; কিন্তু রুশগণ যে অন্যান্য জাতির তুলনায় উদ্ভাবনী শক্তিতে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাও অস্বীকার করা যায় না। প্যারাশুট বাহিনী গঠনের বুদ্ধি রুশগণের মাথায়ই প্রথম খেলে। সৈন্য ও ট্যাঙ্কবাহী বিমানচালনাও তারাই প্রথম পরীক্ষা করে দেখে। অতিকায় বিমান নির্মাণেও তারাই অগ্রণী। কেবল সংখ্যা দ্বারা এই উভয় দেশের

বিমানবলের তুলনামূলক বিচার করা যায় না। উরাল পর্বতে রুশগণ গোপনে তাদের বিমানশক্তি গড়ে তুলেছে ; কাজেই যান্ত্রিক নৈপুণ্যের দিক দিয়েও তাদের তাক লাগাবার মত কোন বৈশিষ্ট্য থাকা কিছু অসম্ভব নয়।”

তাক লাগাবার মত নতুন কিছু না থাকলেও বিপক্ষকে প্রতিহত করার মত বিমানশক্তি যে সোভিয়েট রুশিয়ার ছিল, রুশ রণাঙ্গনে তার যথেষ্ট প্রমাণ মিলেছে।

রণনীতি

জারের আমলের সেই প্রাচীন রুশ রণনীতির অবসান ঘ'টে সোভিয়েট আমলে রুশিয়ার ষ্ট্র্যাটেজী কিভাবে বদলে যায় এবার তাই বলব। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের আধুনিক ষ্ট্র্যাটেজীর উন্নতি বিধানে দুটি বিষয় বিশেষ সাহায্য করে : তার গৃহযুদ্ধের অভিজ্ঞতা এবং আধুনিক রণবিদ্যাশিক্ষার অনুকূল আবহাওয়া। রুশিয়ার গৃহযুদ্ধে লাল ফৌজের নায়কগণ নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভের বিশেষ সুযোগ পান। তার ফলে তাঁদের পক্ষে বাইরের কতকগুলি মরচে ধরা রণপ্রথার প্রভাবমুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ নতুন ধরণে সৈন্যদল গঠন করা সম্ভব হয়। কোন বাঁধাধরা পথে নয়, সম্পূর্ণ বৈপ্লবিক পন্থায় প্রয়োজনের তাগিদে লাল ফৌজ গড়ে ওঠে। প্রথম অবস্থায় লাল ফৌজের রণকৌশল যে খুব উচ্চাঙ্গের ছিল তা নয়,—কিন্তু ষ্ট্র্যাটেজী বা রণনীতিজ্ঞান যে তাদের আগাগোড়াই ভাল ছিল এমন প্রমাণ পাওয়া যায়। তারপর ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ হতে যন্ত্রসজ্জার দিকে মন দিয়ে সোভিয়েট সেনাপতিগণ লাল ফৌজকে আধুনিক রণবিদ্যায় এমন ভাবে সুশিক্ষিত করে তোলেন যার ফলে তাঁদের ষ্ট্র্যাটেজীতেও বিপ্লব ঘটে। অনেকের অনুমান

লাল ফৌজকে দেখেই জার্মানরা আধুনিক যুদ্ধবিদ্যার প্রেরণা পায়। কেবল অনুমান নয়, একথা সত্য যে লাল ফৌজের শক্তিশালী বিমান-বাহিনী, মোটর ও যন্ত্রসজ্জা এবং আধুনিক যুদ্ধের বহু উপকরণ দেখে কয়েক বছর পরে বিভিন্ন দেশ তাদের সেনাদলে সেইগুলির প্রবর্তন করে। এমন কি হিটলারও লর্ড লণ্ডনডেরীকে এক সময় বলেছিলেন :—

"সোভিয়েট রুশিয়া কেবল সামরিক বলে শ্রেষ্ঠত্বই অর্জন করে নি ; তার সঙ্গে রয়েছে এক নতুন সামরিক ভাবধারা।"

দেশের জলবায়ু, ভৌগোলিক অবস্থান, জনবল, অস্ত্রবল, পথঘাট, যানবাহন প্রভৃতি অবলম্বনে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের যে নিজস্ব ষ্ট্র্যাটেজী গড়ে ওঠে তা একটা নির্দিষ্ট রূপ নেয় ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে। রাজনৈতিক লক্ষ্য আত্মরক্ষাত্মক হলেও সোভিয়েট রণনীতি আক্রমণাত্মক। রণনীতি আক্রমণাত্মক হলেই যে পররাজ্য আক্রমণ করতে হবে এমন কোন কথা নেই। এখানেই ফাসিস্ত রাষ্ট্র ও সাম্যবাদী সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে পার্থক্য। জার্মানীর রণনীতিও আক্রমণাত্মক, কিন্তু সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের মত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তার নীতি আত্মরক্ষাত্মক নয়। কাজেই জার্মানী তার আক্রমণাত্মক রণনীতিকে রাজনৈতিক অভীষ্টলাভের জন্য পররাজ্যগ্রাসের অস্ত্ররূপে ব্যবহার করে এবং তার সমরপ্রস্তুতিই সেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। পক্ষান্তরে দেখা যায়, প্রথম হতেই সোভিয়েট শক্তিকে গলা টিপে মারবার জন্য বার হতে নানারূপ চক্রান্ত চলে এবং পূবে জাপান ও পশ্চিমে জার্মানী অহরহ তাকে আক্রমণের ভয় দেখায়। এই আক্রমণের ভয় ছিল বলেই পাল্টা ঘা দিবার জন্য সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রকে বিপুল সমরায়োজন করতে হয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার জন্যই সামরিক ব্যাপারে

আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ না করলে কি শোচনীয় ফল দাঁড়ায় ফ্রান্সের পরাজয় তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। অতএব লাল ফৌজ সোজাসুজি যুদ্ধে প্রচণ্ড পাল্টা ঘা দিয়ে শত্রুনিধনের ষ্ট্র্যাটেজী অবলম্বন করে। তার সামরিক বিধানেই বলা হয় :—

"লাল ফৌজের সামরিক তৎপরতা হবে শত্রুকে ধ্বংস করা। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রকে যদি কখনো বাধ্য হয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয় তবে তখন তার মূল লক্ষ্য হবে চূড়ান্ত জয়লাভ এবং শত্রুকে একেবারে পর্যুদস্ত করা।...... প্রতিপক্ষের ব্যূহের গভীর প্রদেশে চলে গিয়ে তাদের পরিবেষ্টিত ও ধ্বংস করতে হবে।"



সোভিয়েট দেশরক্ষা পরিষদের সদস্য মঃ ম্যালেঙ্কফ

এ হতে বোঝা যায়, সোভিয়েট রণনীতি যুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য হাত পা গুটিয়ে কূর্মাবতার সাজবার পক্ষপাতী নয়। শত্রু আক্রমণ করতে এলে তাকে প্রচণ্ড বেগে গিয়ে পাল্টা ঘা দিতে হবে। এজন্যই সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র তার সমস্ত বাহিনীকে দ্রুত গতিশীল করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। লাল ফৌজের নায়করা আত্মরক্ষার বাহিনী ও আক্রমণের বাহিনীর প্রাচীন সংজ্ঞা ছেড়ে দেন এবং রণকৌশলেও আক্রমণ এবং আত্মরক্ষার পুরাতন পার্থক্যটাকে

বিদায় করেন। তাঁরা মনে করেন, সাফল্যের সহিত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হওয়াই আত্মরক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। আধুনিক বাহিনী-গুলি প্রধানতই আক্রমণের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত ; অতএব আত্মরক্ষার জন্য সেই আক্রমণের বাহিনীগুলিরই সাহায্য নিতে হবে। তবে কোন বাহিনীর ওপরই বেশী জোর দিলে চলবে না। সমবেতভাবে সকল বাহিনী একসঙ্গে প্রয়োগ করে প্রতিপক্ষকে প্রচণ্ড ঘা দিতে হবে। অনেকদিন আগেই তাদের আক্রমণনীতি বর্ণনায় বলা হয় :—

"প্রত্যেক বাহিনীর বৈশিষ্ট্য ও রণশক্তির কথা বিশেষ ভাবে বিবেচনা করে রণাঙ্গনে তা নিয়োজিত করতে হবে এবং প্রত্যেক বাহিনীকেই অন্যান্য বাহিনীর সঙ্গে যথাসম্ভব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে লড়তে হবে। তাছাড়া রণাঙ্গনে এমন সুযোগ দেখে প্রত্যেক বাহিনীকে নিয়োজিত করতে হবে যাতে সে যুদ্ধে পূর্ণ রণশক্তি প্রয়োগের সুবিধা পায়।"

অতএব দেখা যায়, লাল ফৌজের অধিনায়করা আধুনিক যুদ্ধের একটা বাস্তব রূপ বহু পূর্বেই সম্যক ধারণা করতে পেরেছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে কেউ কেউ যা ঠেকে শিখে, সোভিয়েট নায়কগণ পূর্বাহ্ণেই তা বুঝতে পারায় লাল ফৌজকে ঠিক তেমনি ভাবে তাঁরা আধুনিক যুদ্ধের উপযোগী করে গড়ে তোলেন। লাল ফৌজে বিভিন্ন বাহিনীর কার্যভার এভাবে বণ্টিত হয় :—

স্বতন্ত্র ট্যাঙ্কবাহিনীতে থাকবে বিস্তৃত অঞ্চলে আক্রমণ চালাবার জন্য বহু ট্যাঙ্ক ইউনিট এবং মোটর, সাঁজোয়া ইউনিট। সেই সমস্তের পশ্চাতে যাবে মোটরবাহিত পদাতিক ও মোটরবাহিত গোলন্দাজ-বাহিনী। প্রথমোক্ত ট্যাঙ্কবহরের কাজ হবে প্রতিপক্ষের প্রধান যোগাযোগ পথে হানা দেওয়া, বিপক্ষের রিজার্ভ বাহিনী ও সেনা-

নায়কদের উপর বিধ্বংসী আঘাত করা, প্রধান গোলন্দাজ বাহিনীকে বিনাশ করা এবং মূলবাহিনীর পশ্চাদপসরণের পথ বন্ধ করা। মোটর-সাঁজোয়া ইউনিটগুলির কাজ হবে বিপক্ষের পশ্চাদপসরণকারী সেনাদের মধ্যে প্রবেশ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করা এবং পশ্চাৎ দিক হতে আক্রমণ করে তাদের ঘাঁটি হতে বিচ্ছিন্ন করা।

বিমান বাহিনী অগ্রবর্তী ট্যাঙ্কগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে যুদ্ধ করবে। এগিয়ে গিয়ে বিপক্ষের ব্যূহাভ্যন্তরেও সেগুলি আক্রমণ চালাবে। বোমা ফেলে বিপক্ষের যোগসূত্র ছেদ, ব্যূহের পশ্চাৎদিকস্থ ঘাঁটি হতে শত্রুকে বিচ্ছিন্নকরণ এবং তার সরবরাহ বন্ধের চেষ্টা করাও হবে বিমান বাহিনীর কাজ।

গোলন্দাজ বাহিনী কামান দেগে যে কেবল বিপক্ষের অগ্রগতিই রোধ করবে এমন নয়, লাল ফৌজের গোলন্দাজ বাহিনীতে দূরপাল্লার এমন সব কামান থাকবে যেগুলির সাহায্যে বিপক্ষের ব্যূহের অভ্যন্তরস্থিত রিজার্ভ বাহিনী, সেনানায়কদের হেড কোয়ার্টার, পশ্চাৎ-দিকস্থ যানবাহন এমন কি কামানশ্রেণীর ওপর পর্যন্ত প্রচণ্ড ভাবে গোলাবর্ষণ করা চলবে। আর কামানগুলিকে একস্থানে বসিয়ে গোলা দাগা হবে না; সেগুলিকে যত্রতত্র নিয়ে যাবার জন্য মোটরযানে স্থাপিত করা হবে। কাজেই অগ্রগামী সৈন্যদের সেইগুলি বিশেষ সহায়তা করতে পারবে।

এভাবে সকল বাহিনী নিয়ে একযোগে শত্রুর ওপর চূড়ান্ত আক্রমণের বর্ণনা দিতে গিয়ে লাল ফৌজের একখানি মুখপত্রে বলা হয় :—

"শত্রু পরাজিত হয়ে তার সেনা, অস্ত্রশস্ত্র এবং রসদাদি বাঁচাবার জন্য পশ্চাদপসরণের চেষ্টা করছে। তার আগেই আমাদের অগ্রবর্তী

ট্যাঙ্ক ও বিমান বাহিনী প্রতিপক্ষের সম্মুখসেনার পশ্চাতে বহু দূরে চলে যাবে এবং সেখানে গিয়ে তাদের পশ্চাদপসরণের পথ বিচ্ছিন্ন করবে। বিপক্ষের বাহিনী তখন দেখবে চারদিক থেকেই তাদের ওপর আক্রমণ চলছে; কেন না আমাদের সৈন্যরা তার আগেই তাদের পশ্চাদ্দেশে চলে গেছে এবং তাদের পার্শ্বদেশ ভেদ করে ঢুকে পড়েছে। সেই অবস্থায় বিপক্ষ মনোবল হারিয়ে ফেলবে। আমাদের সৈন্যরা তাদের



রাইফেল-চালনায় সোভিয়েট জনসেনা

বেড়াজালে ফেলে চারদিক থেকে এমন ভাবে চাপ দেবে যার ফলে তারা অস্ত্রত্যাগে বাধ্য হবে।"

অতএব দেখা যায়, পশ্চাদ্দিকে যোগসূত্র ছিন্ন করে অকস্মাৎ পার্শ্বদেশ হতে আক্রমণ করত শত্রুকে ঘিরে ফেলে অস্ত্রত্যাগে বাধ্য করার যে কৌশল হিটলারের বাহিনী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে দেখায়, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের লাল ফৌজ সেই কৌশলে বহু আগেই অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

সোভিয়েট ষ্ট্র্যাটেজীর আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, জার্মানদের মত অকস্মাৎ আক্রমণ এবং তড়িৎগতিতে যুদ্ধে ফললাভের স্বপ্ন লাল ফৌজ কখনো দেখে না। অর্থাৎ যুদ্ধে চটক দেখাবার প্রবৃত্তি তাদের কম। তাদের মতে আকস্মিক আক্রমণ ও "ষ্ট্র্যাটেজিক" আক্রমণের মধ্যে পার্থক্য আছে। যুদ্ধকে তারা একটা তাড়াতাড়ির ব্যাপার বলে মনে করে না। অনেকগুলি অবস্থার ওপর ষ্ট্র্যাটেজী নির্ভর করে। তাড়াহুড়ো করে অপ্রত্যাশিত ফললাভের আকাঙ্ক্ষা না করে তারা বরঞ্চ এটাই ধরে নেয় যে, যুদ্ধ দীর্ঘকাল চলবে এবং শত্রু যথাশক্তিতে লড়বে। এসম্বন্ধে একজন সোভিয়েট সমরবিশেষজ্ঞের অভিমত এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি বলেন :—

"আধুনিক যুদ্ধ মুষ্টিযুদ্ধের প্রতিযোগিতা নয় যে অপেক্ষাকৃত ওস্তাদ ব্যক্তি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে অকস্মাৎ এক ঘায়ে ধরাশায়ী করবে। যুদ্ধে প্রতিপক্ষকে পরাভূত করে তাকে নতজানু করতে হলে অবিরাম শক্তি ও সামর্থ্য ঢেলে যেতে হবে।"

পক্ষান্তরে দেখা যায়, জার্মান ষ্ট্র্যাটেজীর মূলেই রয়েছে শত্রুকে অকস্মাৎ আক্রমণ করে অত্যল্পকালের মধ্যে যুদ্ধ শেষ করা। এই নীতিকে ভিত্তি করেই জার্মান 'ব্লিট্‌জক্রীগের' উদ্ভব। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের ষ্ট্র্যাটেজী ঠিক এর বিপরীতধর্মী। যুদ্ধ দীর্ঘকাল চলতে পারে এ মনে করেই সে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং সেই ভাবেই তার সমরপ্রস্তুতি। তার সমরার্থক অর্থনীতি এবং শিল্পব্যবস্থাও সেই নীতির ওপরই প্রতিষ্ঠিত।

মনোবল

লাল ফৌজের কষ্টসহিষ্ণুতা ও মনোবল সম্বন্ধে এবার সংক্ষেপে কিছু বলা যেতে পারে। বেশী আগের দিকে গিয়ে লাভ নেই।

ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধ হওয়ার পর রুশ-জার্মান যুদ্ধের প্রাক্কাল পর্যন্ত সোভিয়েট সামরিক কর্তৃপক্ষ লাল ফৌজকে কষ্টসহিষ্ণু করে তোলবার জন্য যেভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করেন, দু'চার কথায় তা বললেই চলবে। সামরিক কর্তৃপক্ষ স্থির করেন, কার্যত যেভাবে আধুনিক যুদ্ধ হয় ঠিক সেই অবস্থার মধ্যে রেখে সৈন্যদের ট্রেনিং দিতে হবে। প্রায় এক বছর এভাবে তাদের ট্রেনিং চলে। রণাঙ্গনে যেমন অবস্থা হয় তেমন অবস্থায় থেকে নবাগত সৈন্যরা সামরিক শিক্ষা লাভ করে। রাত্রে ঘুমিয়ে আছে, হঠাৎ তাদের মার্চ করার ডাক পড়ল; শীতকালীন অভিযানে যাতে তারা অভ্যস্ত হয়ে ওঠে সেজন্য তুষারাবৃত মাঠে তাদের সারারাত কাটাবার আদেশ হল; সারাদিন হয়ত তারা শিবিরের বাইরেই রইল; শীতে কাতর না হয় সেজন্য সকাল বেলা প্রত্যেকের জন্য ঠাণ্ডা জলে স্নানের ব্যবস্থা হল। এভাবে নানারূপ কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয়ে সোভিয়েট সৈন্যরা সকল অবস্থায়ই যুদ্ধ করার মত যোগ্যতা লাভ করল। কেবল তাই নয়। মার্চ করে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে যেখানে যেমন মালমসলা জুটবে তা দিয়েই অফিসার ও সৈন্যদের একযোগে কিভাবে সৈন্যাবাস নির্মাণ করতে হবে, তাও তারা শিখল। তাছাড়া রণক্ষেত্রে নিজেদের রান্না যাতে নিজেরা করতে পারে তার জন্য তারা প্রত্যেকেই রাঁধতেও অভ্যস্ত হয়ে উঠল। লাল ফৌজ বরফের ওপর দিয়ে স্কী-চালনায় কিরূপ নৈপুণ্য অর্জন করে উত্তরকালে রুশ রণাঙ্গনে তার পরিচয় ভালভাবেই মিলেছে।

এ গেল তাদের কষ্টসহিষ্ণুতার কথা। তাদের মনোবল সম্বন্ধে কিছু বলতে হলেই প্রথমে বলা দরকার যে, সৈন্যদের মনোবল প্রধানত দু'টি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। প্রথমত, অফিসার তথা কর্তৃপক্ষ

তথা গবর্ণমেণ্টের প্রতি সাধারণ সৈন্যদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। দ্বিতীয়ত, যে কারণে যুদ্ধ হচ্ছে সেই কারণের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত জীবনের যোগাযোগ ও সমস্যার সমাধানে তার নিজের দায়িত্ববোধ। সেজন্য চাই যথেষ্ট রাজনৈতিক চেতনা। সোভিয়েট লাল ফৌজ যে জগতে



মস্কোতে বিংশ বিপ্লব বার্ষিক উৎসবে উজবেকীস্তানের তরুণীদল। এদের মায়েরাই একসময় বোরখা পরে বেরুত। রুশ-জার্মান যুদ্ধ বাধলে এইসব তরুণীর দল লাল ফৌজকে নানাভাবে সাহায্য করে।

সর্বাপেক্ষা রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন বাহিনী তা বোধ হয় না বললেও চলে।

সাধারণত যেসব কারণে অফিসারদের প্রতি সাধারণ সৈন্যগণের শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস থাকে না, লাল ফৌজ তা থেকে এক রকম ষোল আনাঃ

মুক্ত বললেই চলে। পুঁজিতন্ত্রী দেশগুলিতে প্রধানত অভিজাত ও ধনীর দুলালরাই সৈন্যদলে বড় বড় পদগুলি দখল করে থাকেন; সাধারণ সৈন্যরা যোগ্যতা দেখিয়ে পদোন্নতির সুযোগ খুব কমই পায়। তারপর সাধারণ সৈন্য ও অফিসারদের জীবনযাত্রার মান এত বেশী পৃথক থাকে যে, সাধারণ সৈন্যদের পক্ষে অনেক ক্ষেত্রেই তা ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। লাল ফৌজে এর প্রশ্রয় খুবই কম। যোগ্যতা অনুসারেই সেখানে পদোন্নতি হয় এবং সাধারণ সৈন্য ও অফিসারের বেতন এক না হলেও এমন কোন আকাশপাতাল পার্থক্য তাতে নেই যা ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। কিভাবে পদোন্নতি ব্যাপারে যোগ্যতার সমাদর করা হয় নিম্নের ব্যাপার থেকেই তা বোঝা যাবে। অনেক সময়ই কোনখানে একটা যুদ্ধ হয়ে যাবার পর যখন তাতে একটু ঢিলা পড়ে এবং সৈন্যরা বিশ্রামের জন্য শিবিরে ফিরে যায় তখন বিশ্রামশিবিরে সেই যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা হয়। তাতে প্রত্যেক সৈন্যই যোগ দিতে পারে। তারা স্বপক্ষের দোষগুণ নিয়ে আলোচনা করে এবং কোন কোন ব্যাপারে তীব্র সমালোচনাও হয়। সেই আলোচনায় যারা সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি ও সামরিক জ্ঞানের পরিচয় দেয় তারাই পদোন্নতি লাভ করে। একজন সাধারণ সৈনিকও এরূপে নায়কের পদ পেয়ে যেতে পারে। যোগ্যতার এভাবে সমাদর করা হয় বলেই লাল ফৌজের নায়কগণ ও সাধারণ সৈন্যদের মধ্যে সৌহার্দ্যের ভাব খুব বেশী এবং তাদের সকলের মধ্যেই সৈনিকসুলভ মনোভাব প্রবল। বলা বাহুল্য, এই সৈনিকসুলভ মনোভাবের ওপরই সৈন্যদলের শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা এবং সর্বোপরি তাদের রণনৈপুণ্য বহুলাংশে নির্ভর করে।

এর পর দ্বিতীয় প্রশ্ন হল সৈন্যরা কিসের জন্য লড়বে? তার

সঙ্গে এ প্রশ্নটাও বিজড়িত থাকে যে, একজন সৈন্য যখন তার রাষ্ট্রের জন্য লড়বে তখন রাষ্ট্র সেই সৈন্যের ও তার পরিবারের জন্য কি করবে? বেতন, পদোন্নতি এবং পোষ্যবর্গের ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রশ্ন তাতে ওঠে। কোন সৈন্য যদি নিশ্চিন্ত হতে পারে যে, অক্ষম হয়ে পড়লে সে পেন্সন পাবে বা মারা গেলে তার পোষ্যবর্গের ভরণপোষণের ব্যবস্থা রাষ্ট্র করবে তবে স্বভাবতই রণক্ষেত্রে তার মনোবল বেশী হবে। সোভিয়েট সৈন্য যে এ সম্বন্ধে একরূপ নিশ্চিন্ত বলাই বৃথা। রণাঙ্গনে গিয়ে কেউ একেবারে অক্ষম হয়ে পডলে পূর্ণ বেতনে তাকে পেন্সন দেওয়া হয়। কেউ আংশিক ভাবে অকর্মণ্য হয়ে পডলে সে আংশিক বেতন ভাতা হিসাবে পায়। আর যুদ্ধে কেউ মারা গেলে তার পোষ্যবর্গকে পেন্সন-হিসাবে পুরা বেতন দেওয়া হয়। অবশ্য যুদ্ধে যাওয়ার আগে যার যেমন রোজগার তেমন হারেই কর্তৃপক্ষ পেন্সন ও ভাতার ব্যবস্থা করেন। সৈন্যের পোষ্যবর্গের মধ্যে ধরা হয় তার নাবালক ছেলেপিলে ও ভাইবোন, স্ত্রী, ষাট বছরের বেশী বয়স হলে বাপ এবং পঞ্চান্ন বছরের উর্ধ্বে হলে মা। রাষ্ট্র থেকে সরাসরি তাদের জন্য ভাতার ব্যবস্থা তো করা হয়ই; তাছাড়া ট্রেড য়ুনিয়ন এবং যৌথ খামার হতেও তাদের অনেক সময় সাহায্য করা হয়। এমন কি রুশ-জার্মান যুদ্ধ বাধার পর বিদ্যালয়ের ছাত্ররা পর্যন্ত সৈন্যদের স্ত্রীপুত্রপরিজনকে সাহায্যের জন্য সমিতি গঠন করে।

অতএব সোভিয়েট সৈন্য জানে যে, দেশের জন্য লড়তে গিয়ে যদি তার জীবন যায় তবে দেশও তার পরিবারকে রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে।

আহত সৈন্যের পেন্সন এবং নিহত সৈন্যের পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা পুঁজিতন্ত্রী দেশগুলিতেও করা হয়। সুতরাং এ সম্বন্ধে

নিশ্চয়তাই লালফৌজের পক্ষে একটা বড় কথা নয়। বড় কথা হল এই—সে জানে যে কিসের জন্য সে লড়ছে, তার শত্রু কারা এবং রাজনৈতিক সমস্যাই বা কি? এই রাজনৈতিক চেতনাই লাল ফৌজের এক প্রধান অস্ত্র ও বৈশিষ্ট্য। সাধারণ অধিবাসীদের ন্যায় সোভিয়েট সৈন্যরাও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমান অধিকার ভোগ করে থাকে। কিন্তু অধিকাংশ দেশেই সৈন্যদের রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে ঠিক এর বিপরীত। সৈন্যদের কেবল রাজনৈতিক জ্ঞানলাভ ও রাজনীতি সম্পর্কে আলোচনায় উৎসাহিতই করা হয় না, পরন্তু লাল ফৌজের কর্তৃপক্ষ তা একান্ত আবশ্যক বলে মনে করেন। সেজন্যই আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কোন দেশের সঙ্গে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের কখন কিরূপ সম্পর্ক দাঁড়ায়, সেই সম্বন্ধে বক্তৃতা ও আলোচনার দ্বারা সোভিয়েট সৈন্যদের সর্বদা ওয়াকিফহাল রাখা হয়। তাতে তারা বুঝতে পারে কে যথার্থ শত্রু এবং কে যথার্থ মিত্র। তাছাড়া কিসে বিপদ আসতে পারে সে সম্বন্ধেও তারা সম্পূর্ণ সচেতন থাকে। সৈন্যদের মধ্যে এই রাজনৈতিক চেতনাবৃদ্ধির জন্যই লাল ফৌজে 'পলিটিক্যাল কমিসার' প্রথা প্রবর্তিত হয়েছিল। সামরিক শিক্ষার ভার ছিল সেনাপতিদের হাতে এবং রাজনৈতিক শিক্ষার ভার ছিল 'পলিটিক্যাল কমিসারদের' হাতে। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি 'পলিটিক্যাল কমিসার' প্রথা এই বলে তুলে দেওয়া হয়েছে যে, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রবাসীরা এখন এতখানি রাজনৈতিক চেতনা লাভ করেছে যাতে সৈন্যদলে ভর্তি হলে তাদের জন্য আর পৃথক ভাবে রাজনৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা না করলেও চলে। এতদ্ব্যতীত জারের আমলের যেসকল সেনাপতি লাল ফৌজে যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা প্রথম দিকে সৈন্যদলে রাজনৈতিক শিক্ষার আবশ্যকতা তেমন উপলব্ধি করেন নি এবং তাতে তাঁদের বিশেষ

আস্থাও ছিল না। কিন্তু এখন তাঁরা সৈন্যদের রাজনৈতিক চেতনার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছেন এবং তাঁদের মনে যেসকল সন্দেহ ছিল এতদিনে তার নিরসন হয়েছে। কাজেই সেনাপতিরাই বর্তমানে সামরিক ও রাজনৈতিক শিক্ষাদানের দায়িত্ব গ্রহণে সম্পূর্ণ সক্ষম।

লাল ফৌজ গঠনের মূলে রয়েছে এই ধারণা, যে চিন্তা করতে পারবে সেই ভাল যোদ্ধা হবে। সৈন্যদের প্রশ্ন করার কিছু নেই, নির্বিচারে যুদ্ধ করা ও মরাই তাদের কাজ—লাল ফৌজের মধ্যে এ ধারণা মোটেই নেই। সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ মনে করেন, সৈন্যরা অন্ধ আজ্ঞাবহ না হয়ে যদি যুক্তি দিয়ে বুঝতে পারে কিসের জন্য ও কেন তারা লড়ছে—তবেই তারা যুদ্ধে বেশী বল পায়। উদ্যম, বিচারশক্তি ও আত্মপ্রত্যয়ই লাল ফৌজের প্রধান গুণ। এই গুণাবলীর বিকাশের জন্যই চিন্তা করতে, রাজনৈতিক প্রশ্ন বুঝতে, দেশের রাজনৈতিক জীবনে অংশ গ্রহণ করতে এবং যুদ্ধ সম্বন্ধে আলোচনা ও স্বাধীন মতামত প্রকাশে তাদের উৎসাহিত করা হয়। এই বাস্তববোধই রণক্ষেত্রে তাদের মনোবল রক্ষার প্রধান সহায়।

রুশ-জার্মান যুদ্ধ

১৯৪১ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকাল আসতেই চারদিকে খবর রটতে লাগল যে, ফিনল্যাণ্ড, পোলাণ্ড ও রুমানিয়ায় বিপুল জার্মান সৈন্য সন্নিবেশ করা হয়েছে এবং অপর দিকে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষও উত্তরে বল্টিক সাগর থেকে দক্ষিণে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত সুদীর্ঘ সীমান্তে ব্যাপক ভাবে সৈন্য আমদানী করেছেন। উভয় দেশের মধ্যে মনোমালিন্য চলেছে বলে অনেক খবর প্রকাশ পেল; কিন্তু ২০শে জুনও সোভিয়েট সরকারী সংবাদসরবরাহ প্রতিষ্ঠানেব তরফ থেকে বলা হল যে, উভয় দেশের মধ্যে মৈত্রী কোন ভাবে ক্ষুণ্ণ হয় নি বা হওয়ার কিছু আশঙ্কাও নেই। কিন্তু ২২শে জুন সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রকে কোনরূপ চরমপত্র না দিয়েই প্রায় দু'শ' ডিভিসন জার্মান সৈন্য অকস্মাৎ তাকে আক্রমণ করে বসল এবং তার পনরশ' মাইল ব্যাপী দীর্ঘ সীমান্তে এক বিরাট অভিযান চালাল। জার্মান বিমান বাহিনী সীমান্তস্থিত বিমানঘাঁটি-সমূহ এবং কিয়েফ ও অন্যান্য সহরে হানা দিয়ে সোভিয়েট পক্ষকে এই আক্রমণের বার্তা প্রথম জানাল। সেদিনই সন্ধ্যাবেলা বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিল এক বেতার-বক্তৃতায় ঘোষণা করলেন যে, বৃটেন এযুদ্ধে যথাসাধ্য রুশিয়াকে সাহায্য করবে। তার অব্যবহিত পরেই বৃটিশ সামরিক ও অর্থনৈতিক প্রতিনিধিদল মস্কো রওনা হলেন।

প্রতিপক্ষকে কোনরূপ চরমপত্র না দিয়ে অতর্কিতে আক্রমণ করলে আক্রমণকারীরা প্রথম দিকে কিছু সুবিধা পাবেই। কাজেই বল্টিক থেকে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত সুদীর্ঘ রণাঙ্গনের সর্বত্রই জার্মান যান্ত্রিক

বাহিনীর সেই সুবিধা হতে লাগল। অবশ্য আক্রমণের প্রথম ধাক্কা গেল সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভূ্ত নতুন এলাকায়। আগেই বলেছি, ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে জার্মানরা পোলাণ্ড-আক্রমণ করার পর সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র আত্মরক্ষার জন্য তার সীমান্ত কিছু সম্প্রসারিত করে। ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধ হয়ে গেলে লেনিনগ্রাডের



সামরিক পরিচ্ছদে একদল সোভিয়েট নারী

উত্তরে লাডোগা হ্রদের চতুর্দিকস্থ এলাকা সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভূ্ত করা হয়। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে তিনটি বল্টিক রাষ্ট্র লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া এবং এস্তোনিয়া সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দেয়। পোলাণ্ডের পশ্চিম অর্ধাংশ যখন জার্মানদের হাতে যায় তখন

তার পূর্বাংশ সোভিয়েট সৈন্যরা দখল করে। এছাড়া ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে রুমানিয়ার বেসারাবিয়া প্রদেশ বিচ্ছিন্ন হয়ে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। জার্মান বাহিনীর প্রথম চাপ পড়ে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের এই নতুন এলাকায়।

আক্রমণের প্রথম দিকে ফিনল্যাণ্ড মৌখিক নিরপেক্ষতা প্রকাশ করে; কিন্তু জার্মানরা ফিনল্যাণ্ড দিয়ে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযান চালাবার অনুমতি পায়। কাজেই ফিনল্যাণ্ডের নিরপেক্ষতার মুখোস দেখতে দেখতেই খসে পড়ে এবং অচিরেই সে এই অভিযানে জার্মানদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দেয়। দক্ষিণে হাঙ্গারী এবং রুমানিয়ার সৈন্যরাও জার্মানদের পক্ষাবলম্বন করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।

রুশ রণাঙ্গনে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার এগার দিন পরই জার্মান ইস্তাহারে ঘোষণা করা হয়, "সোভিয়েট বাহিনীর প্রতিরোধশক্তি বিচূর্ণ হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়।" কিন্তু একদিন বাদেই আবার বলা হয় যে, জার্মান সৈন্যদের "প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হচ্ছে।" এর পরে জার্মান ইস্তাহারগুলিতে এমন স্ববিরোধী ঘোষণা আরো অনেকবারই করতে দেখা গেছে। কিন্তু সোভিয়েট বাহিনীর প্রতিরোধশক্তিকে বিচূর্ণ করা যে কি কঠিন ব্যাপার, পরে জার্মানরা ভালভাবেই তা টের পেয়েছে।

রুশ-জার্মান যুদ্ধের মত এত অস্ত্রশস্ত্র ও জনবল নিয়ে এমন বিরাট যুদ্ধ পৃথিবীতে এ পর্যন্ত হয় নি। পনর শ' মাইল দীর্ঘ রণাঙ্গনে লক্ষ লক্ষ লোক মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করে। অতি আধুনিক ও ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্রসমূহের এমন ব্যাপক ও সমবেত প্রয়োগ ইতিপূর্বে আর কোথাও হয়েছে বলে শোনা যায় নি।

আক্রমণের প্রথম দু'সপ্তাহের মধ্যেই সোভিয়েট পক্ষ ধাক্কা খানিকটা সামলে নেয় এবং ইত্যবসরে দেশের অভ্যন্তর হতে অজস্র সৈন্য ও

প্রচুর সমরোপকরণ বিভিন্ন রণাঙ্গনে আনিয়ে প্রতিপক্ষকে প্রবল বাধা ও পাল্টা ঘা দিতে সক্ষম হয়। ফলে জার্মানদের গতি অপেক্ষাকৃত মন্থর হয়ে আসে; এমন কি কয়েকদিন যুদ্ধ একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ ভাবে চলে বললেও অত্যুক্তি হয় না। জার্মান বাহিনী অবশ্য প্রাণপণে বিভিন্ন দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করে, কিন্তু অগ্রসর হতে গিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সোভিয়েট সেনার নিকট তাদের বাধা পেতে হয়।

প্রথম ধাক্কায় কিছু এগিয়েই জার্মানরা প্রধানত তিনটি লক্ষ্য স্থির করে অভিযান চালায়। উত্তরে তাদের লক্ষ্য থাকে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সমৃদ্ধ নগর লেনিনগ্রাড দখল করা। এই নগর সোভিয়েট যুক্ত-রাষ্ট্রের একটি প্রধান ব্যবসাকেন্দ্র। এ দখল করতে পারলে রুশদের বল্টিকে বেরুবার পথ বন্ধ হয়। এছাড়া বল্টিক সাগরে যে সোভিয়েট নৌবহর আছে তাও অকেজো হয়ে পড়ে। জার্মানীর পক্ষে তা কম লাভের কথা নয়। এতদ্ভিন্ন আরো উত্তরে গেলে রয়েছে প্রসিদ্ধ সোভিয়েট বন্দর মুরমানস্ক। উত্তর দিকে সেই তুষারমুক্ত সোভিয়েট বন্দর দখলের জন্যও জার্মানরা ফিনল্যাণ্ডের মধ্য দিয়ে ফিনদের সাহায্যে এক অভিযান চালায়।

লেলিনগ্রাডের দক্ষিণে জার্মান বাহিনী মিন্স্ক হতে স্মোলেনস্ক হয়ে মস্কো পৌছার চেষ্টা করে। স্মোলেনস্ক হতে মস্কোর দূরত্ব ২৫০ মাইল। স্মোলেনস্কের দিকে অগ্রসর হবার জন্য জার্মানরা দু' বাহু প্রসার করে।

তারপর আরও দক্ষিণে জার্মানদের লক্ষ্য হয় য়ুক্রেনের রাজধানী কিয়েফ। অবশ্য দক্ষিণে কৃষ্ণসাগরতীরবর্তী ওডেসা বন্দরও তাদের অন্যতম লক্ষ্য হয়ে ওঠে। প্রথম দিকে জার্মানরা চেষ্টা করেছিল প্যারাশুট নামিয়ে ক্রীট দ্বীপের মত ওডেসা বন্দরও দখল করা যায়

কিনা ; কিন্তু তাতে সাফল্যের সম্ভাবনা না দেখে তারা স্থলপথেই ওডেসা পৌছার চেষ্টা করে।

উত্তরে লেনিনগ্রাডমুখী অভিযানে জার্মানরা ভিনস্ক-লেনিনগ্রাড রেলপথ ধরে এগিয়ে গিয়ে প্রথম ঘা খায় অষ্ট্রোফ ষ্টেসনের কাছে। সেখানে সোভিয়েট বাহিনীর সঙ্গে এক ভীষণ যুদ্ধে জার্মানদের প্রভূত ক্ষতি হয় এবং কিছুদিনের মত তাদের অগ্রগতি সেখানে থেমে যায়। সেদিকে যুদ্ধ তখনো লাটভিয়া এবং এস্তোনিয়ার বুকে। আরো উত্তরে ফিনল্যাণ্ড হতেও সেই সময় লেনিনগ্রাড দখলের জন্য প্রবল চেষ্টা চলে।

মধ্য রণাঙ্গনে অর্থাৎ মস্কোর দিকে অভিযানে জার্মানরা উত্তরে লেপেলের দিকে এক বাহু এবং তার দক্ষিণে বোব্রুইস্কের দিকে আর এক বাহু বিস্তার করে। লেপেল অঞ্চলে উভয় পক্ষে এক বিরাট ট্যাঙ্কযুদ্ধ হয় এবং তাতে সোভিয়েট সেনা বিশেষ কৃতিত্ব দেখায়। জার্মানদের দক্ষিণ বাহু বেরেজিনা পার হয়ে নীপার নদীর তীরে গিয়ে পৌছে। নীপার নদী বোব্রুইস্ক হতে ৩০ মাইল পূবে। সেখানে নীপার পার হবার চেষ্টা করলে লাল ফৌজ জার্মানদের প্রবল বাধা দেয় এবং তাতে উভয় পক্ষের বিস্তর ক্ষতি হয়। প্রথম চেষ্টায় জার্মানরা নীপার নদী অতিক্রমে অসমর্থ হয়।

তারপর পশ্চিম য়ুক্রেন অর্থাৎ সোভিয়েট অধিকৃত পোলাণ্ডের দক্ষিণাংশে প্রিপেট জলাভূমির দক্ষিণেও জার্মান 'পানৎসার' বাহিনী'* নির্মমভাবে আক্রমণ চালায়। তবে বিনা বাধায় তারা বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে না। তারও দক্ষিণে বেসারাবিয়ায় প্রবল বাধা

* জার্মান সাঁজোয়া বাহিনী।

সত্ত্বেও জার্মান এবং রুমানীয় বাহিনী এগিয়ে চলে। বুকোভিনার অন্তর্গত সারনউটি দখল করার পর তারা গিয়ে নীষ্টার নদীর তীরে উপনীত হয়। এই এলাকায় যুদ্ধ চালাবার প্রধান দায়িত্ব পড়ে রুমানীয় বাহিনীর ওপর।

৮ই জুলাই জার্মানরা সর্বপ্রথম দাবী করে যে, নাৎসী বাহিনী ষ্ট্যালিন লাইনের কয়েক স্থান ভেদ করেছে এবং তাদের বিমানবাহিনী সোভিয়েট সৈন্যদের রসদ বন্ধ ও যোগাযোগ ছিন্ন করার জন্য পশ্চাৎ দিকে জোর বোমা ফেলছে। হাঙ্গারীয় বাহিনী উজানের দিকে নীষ্টার নদী অতিক্রম করেছে বলেও জার্মান তরফ থেকে দাবী করা হয়।

এই ষ্ট্যালিন লাইনেই রচিত হয়েছিল সোভিয়েট পক্ষের প্রধান ব্যূহ। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের আগে মূল সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম দিকে যেখানে সীমান্ত ছিল সেখানেই এই ব্যূহ রচিত হয়। এই ব্যূহ ভেদ করতে গিয়েই জার্মানরা সোভিয়েট প্রতিরোধশক্তির যথার্থ পরিচয় পায় এবং রুশ রণাঙ্গনে যুদ্ধ প্রচণ্ড হয়ে ওঠে। ৮ই জুলাই ষ্ট্যালিন লাইন ভেদ করতে গিয়ে মাত্র একটি যুদ্ধেই জার্মানীর ৭ হাজার সৈন্য মারা যায় এবং ১৫ হাজার সৈন্য বন্দী হয়। লাল ফৌজ জার্মান ট্যাঙ্ক বহরকে ৭ মাইল অগ্রসর হতে দেয় এবং সেগুলিকে মূল বাহিনী হতে বিচ্ছিন্ন করে ধ্বংস করে। লেপেল রণাঙ্গনেও জার্মান যান্ত্রিক বাহিনী তখন এক যুদ্ধে মার খায়। তারা শত শত নিহত সৈন্যকে রণক্ষেত্রে ফেলে রেখে পশ্চিম দিকে অপসরণ করে এবং দুটি জার্মান সাঁজোয়া রেজিমেণ্ট নিশ্চিহ্ন হয়। পোলটস্কের এক যুদ্ধেও জার্মানরা বিস্তর সৈন্য হারায়। ১১ই জুলাই এক খবর পাওয়া যায় যে, প্রায় ৮০ লক্ষ সোভিয়েট সৈন্য দেশের অভ্যন্তর হতে রণাঙ্গনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

সোভিয়েট তরফ থেকে মঃ লজোভস্কি এক সাংবাদিক সম্মেলনে তখন বলেন যে, প্রথম ১৯ দিনের যুদ্ধে জার্মান পক্ষের ১০ লক্ষাধিক সৈন্য হতাহত ও বন্দী হয়েছে। অপর দিকে জার্মান হাই কমাণ্ডের এক ইস্তাহারে দাবী করা হয় যে, লাল ফৌজের কয়েকজন জেনারেল ও ডিভিসন-কমাণ্ডার সমেত ৩ লক্ষ ২৩ হাজার সৈন্য বন্দী হয়েছে। এছাড়া সোভিয়েট পক্ষের ৩৩৩২টি ট্যাঙ্ক, ১৮০৯টি কামান এবং আরো বিস্তর রণসম্ভার জার্মানরা হস্তগত করেছে।

যুদ্ধের সময় দুই পক্ষের প্রদত্ত বিবরণেই কিছু অতিরঞ্জন থাকা সম্ভব; কিন্তু তা হলেও এই বিবরণ থেকে অনুমান করতে কোনই কষ্ট হয় না যে, তিন সপ্তাহের মধ্যেই রুশ-জার্মান যুদ্ধ কিরূপ রুদ্র মূর্তি পরিগ্রহ করে।

সেনাপতিগণ

রুশ-জার্মান যুদ্ধে প্রথম দিকে যেসকল সেনাপতির ওপর প্রধানত সমরচালনার ভার অর্পিত হয় এবার তাঁদের কিছু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যেতে পারে।

আগে সোভিয়েট সেনাপতিগণের কথাই বলা যাক। সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ সমস্ত রণাঙ্গনকে প্রধানত তিনটি এলাকায় বিভক্ত করে উত্তরে লেনিনগ্রাড এলাকায় মার্শাল ভরোশিলফ, মধ্যে স্মোলেনস্ক এলাকায় মার্শাল টিমোশেঙ্কো এবং দক্ষিণে য়ুক্রেন এলাকায় মার্শাল বুদেনীর ওপর সমর পরিচালনার ভার দেন।

মার্শাল ক্লিমেন্ট ইয়েফ্রেমোভিটশ ভরোশিলফ ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে রুশিয়ায় এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মা এক পরিবারে পরিচারিকার কাজ করতেন এবং তাঁর পিতা ছিলেন একজন সাধারণ শ্রমিক। ভরোশিলফকে বাল্যে ক্লিম বলে ডাকা হত। সাত বছর

বয়সে তিনি দৈনিক দু'আনা মজুরীতে এক খনিতে কাজে নিযুক্ত হন। তের বছর বয়স পর্যন্ত নানা কষ্টে কাটবার পর একজন শিক্ষকের সুনজরে পড়ায় তাঁর অদৃষ্টে কিছু লেখাপড়া শিক্ষা ঘটে। দু'বছর বিদ্যালয়ে পড়ার পর তিনি উক্ত শিক্ষকেরই সহায়তায় একটি লোহার কারখানায় চাকুরী পান। ষোল বছর বয়সে তিনি বিপ্লবীদলে যোগ দেন এবং ক্রমে ষ্ট্যালিনের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হয়ে ওঠেন। তাঁকে কয়েকবার সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করা হয়। ১৯১৮-২০ খৃষ্টাব্দে রুশ গৃহযুদ্ধে তিনি বিপ্লবী দলের স্থলসেনার অধিনায়ক রূপে যোগ দেন এবং য়ুক্রেন হতে নানা বিঘ্ন অতিক্রম করে সদলবলে পশ্চাদপসরণে সক্ষম হওয়ায় তাঁর সামরিক খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। লাল ফৌজের যন্ত্রসজ্জায় তিনিই প্রথম ও প্রধান উদ্যোগী। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ হতে রুশ-জার্মান যুদ্ধ বাধা পর্যন্ত তিনি সোভিয়েট সমর সচিবপদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দ হতে তিনি কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় সমিতির সদস্য।



মার্শাল ভরোশিলফ

মার্শাল ভরোশিলফ কেবল একজন যোদ্ধাই নন, তিনি বিদ্যানুরাগীও বটে। সমগ্র সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে তিনি ৭১০টি ক্লাব ও বিদ্যালয় এবং ৯৫৪৬টি পাঠাগার স্থাপন করেন।. তাঁরই একান্ত চেষ্টায় লাল ফৌজের মধ্যে ব্যাপকভাবে শিক্ষাবিস্তার হয়।

মধ্য রণাঙ্গনের ভারপ্রাপ্ত রুশ সেনাপতি মার্শাল টিমোশেঙ্কোর নাম ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের আগে তেমন খ্যাত ছিল না। গত মহাসমরে তিনি জারের সৈন্যদলে থেকে যুদ্ধ করেছিলেন। অবশ্য ভরোশিলফের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে এবং তখন হতেই তিনি লাল ফৌজে কাজ করছেন। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে লাল ফৌজে যে ছাটাই হয় তার পরই মার্শাল টিমোশেঙ্কোর প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। পোলাণ্ড অভিযানে তিনি এবং জেনারেল কায়ালফ সোভিয়েট বাহিনীর দুটি শাখাকে পূর্ব পোলাণ্ডে পরিচালিত করেন। তারপর রুশ-ফিন যুদ্ধে তিনি ভরোশিলফের স্থলাভিষিক্ত হয়ে সোভিয়েট বাহিনী পরিচালনার ভার পান। ফিনল্যাণ্ডের যুদ্ধে তাঁর খ্যাতি যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়।

য়ুক্রেন রণাঙ্গনের প্রধান সোভিয়েট সেনাপতি মার্শাল বুদেনীর সঙ্গে মার্শাল ভরোশিলফের পরিচয় হয় জারিৎসিন (বর্তমান ষ্ট্যালিন-গ্রাড) যুদ্ধের সময়। জারিৎসিনে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে মঃ ষ্ট্যালিনের নেতৃত্বে একটি বিপ্লবী সমর পরিষদ গঠিত হয় এবং সেখান থেকেই মঃ ষ্ট্যালিন বিপ্লববিরোধীদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে তাঁর অপূর্ব সামরিক বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। তৎকালীন সোভিয়েট প্রধান সেনাপতি লিয়ঁ ট্রট্স্কীর পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করে মঃ ষ্ট্যলিন তখন তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনায় যুদ্ধ চালিয়ে গৃহযুদ্ধের যে মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তাতে তিনি মার্শাল বুদেনীর কাছ থেকে অনেকখানি সাহায্য পেয়েছিলেন। তারপর ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে মার্শাল ভরোশিলফ যখন সমর পরিষদের সভাপতি হন তখন তিনি বুদেনীকে একটি অশ্বারোহী দলের নায়ক করবেন বলে স্থির করেন। তদনুসারে তিনি প্রথম অশ্বারোহী কোর গঠন করে তার অধিনায়কত্ব বুদেনীকে দেন।

বুদেনী প্রথমে ছিলেন একজন অশিক্ষিত ও অমার্জিত চাষী। কম্যুনিষ্টদের তিনি আগে বাস্তবিকই ঘৃণা করতেন। কিন্তু ক্রমশ তিনি বিপ্লবপন্থী হয়ে ওঠেন এবং অবশেষে লাল ফৌজে যোগ দেন। তিনি একজন সুদক্ষ অশ্বারোহী এবং রুশ-জাপান যুদ্ধে তিনি জারের পক্ষে লড়াই করেছিলেন। ভরোশিলফের প্রতি তাঁর একটা শিশুসুলভ প্রীতি আছে। বন্ধু ভরোশিলফ বললে তিনি না করতে পারেন এমন কাজ নেই। চেহারা তাঁর রুক্ষ, বিশাল গুম্ফরাশি তাঁর বৈশিষ্ট্য। সংকল্পে দৃঢ়তাই তাঁর চরিত্রের প্রধান গুণ।

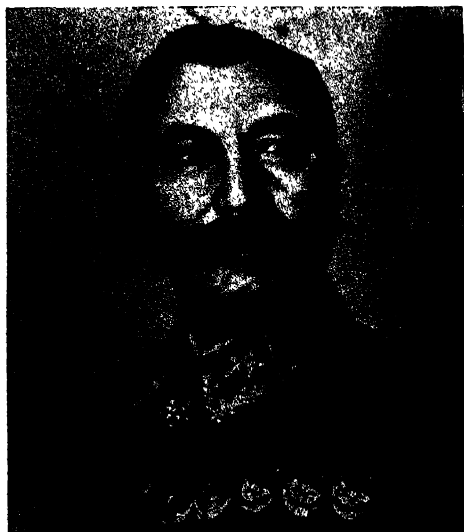


মার্শাল টিমোশেঙ্কো

এবার জার্মান সেনাপতিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেব। উত্তর রণাঙ্গনে মার্শাল ভরোশিলফের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে যিনি জার্মান বাহিনীর সেনাপতিত্ব লাভ করেন তাঁর নাম রিটার ফন লীব। তিনি ব্যাভেরিয়ার লোক। গত মহাযুদ্ধে রণাঙ্গনে থেকে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি জার্মান সেনানীমণ্ডলীতে একজন মেজর ছিলেন। দীর্ঘকাল সমর বিভাগে পদস্থ কর্মচারীর পদে কাজ করার পর ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে হিটলারের কোপদৃষ্টিতে পড়ে তিনি অবসর গ্রহণে বাধ্য হন। কিন্তু ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ বাধলে পর আবার তাঁকে জার্মান সেনানীমণ্ডলীতে ফিরিয়ে আনা হয়। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে তাঁর অধিনায়কত্বে প্রায় ৩০ ডিভিসন

জার্মান সৈন্য হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ম আক্রমণ করে। জেনারেল ফন কুয়েচলার এবং ফিল্ড মার্শাল ফন রাইখনাউ তখন তাঁর অধীনে সেনাপতিত্ব করেছিলেন।

মধ্য রণাঙ্গনে মার্শাল টিমোশেঙ্কোর প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে জার্মান বাহিনী পরিচালিত করার ভার পান ফিল্ড মার্শাল ফন বক। তিনি একজন মেজর জেনারেলের পুত্র; বয়স ষাটের উর্দ্ধে। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়া অভিযানকারী একটি জার্মান বাহিনীর তিনি অধিনায়ক ছিলেন। সেই বছরই শরৎকালে চেকোশ্লোভাকিয়ার সীমান্তঅঞ্চল দখলে তিনি জার্মান বাহিনীর অধিনায়কত্ব করেন। ফ্রান্সে তাঁরই অধীনে জার্মান বাহিনী সোম-আইন অঞ্চলে ফরাসীদের পাল্টা আক্রমণ প্রতিহত করে।



মার্শাল বুদেনী

ফিল্ড মার্শাল ফন ক্লুগ এবং ফিল্ড মার্শাল কাসারলিং ফন বকের অধীনে রুশ-জার্মান যুদ্ধে সেনাপতিত্ব লাভ করেন। কাসারলিং মধ্য রণাঙ্গনে 'লুফৎভাফের' অর্থাৎ জার্মান বিমান বাহিনীর অধিনায়কত্ব

পান। ফন ক্লুগ ফ্রান্সে ফ্ল্যাণ্ডার্সের যুদ্ধে জেনারেলপদে থেকে একটি জার্মান বাহিনী পরিচালিত করেছিলেন।

য়ুক্রেনের দিকে অর্থাৎ দক্ষিণ রণাঙ্গনে মার্শাল বুদেনীর প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে জার্মান বাহিনী পরিচালিত করেন ফিল্ড মার্শাল ফন রুণ্ডষ্টেড্ট্। তাঁর বয়স ষাটের বেশী এবং তিনিও ফন লীবের ন্যায় বর্তমান মহাযুদ্ধ বাধলে অবসর-জীবন থেকে পুনরায় সেনানীমণ্ডলীতে ফিরে আসেন। অবশ্য ফন লীবের মত তাঁকে হিটলারের বিরাগভাজন হয়ে অবসর নিতে হয়েছিল না, স্বাস্থ্যভঙ্গের দরুণ তিনি নিজেই অবসর নিয়েছিলেন। জন্ম তাঁর প্রুশিয়ায়। পোলদের বিরুদ্ধে তিনি একটি জার্মান বাহিনীর অধিনায়কত্ব করেন এবং তারপর ফ্রান্সে ৫০ ডিভিসন জার্মান সৈন্যের সাহায্যে বিরাট অভিযান চালাবার ভার তিনি পান। তাঁরই পরিচালিত বাহিনী আর্দেনেস ও মিউজে ফরাসী ব্যূহ ভেদ করে।

য়ুক্রেন রণাঙ্গনে ফিল্ড মার্শাল ফন রাইখনাউ ফন রুণ্ডষ্টেডটের অধীনে সেনাপতিত্ব পান। তিনি 'কূটনৈতিক সেনাপতি' নামে সমধিক পরিচিত। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ হতে তিনি একজন পাক্কা নাৎসী হন। খেলাধূলার মধ্য দিয়ে সামরিক শিক্ষাদানের তিনি বিশেষ পক্ষপাতী। তিনি বহু ভাষাবিদ্ এবং জার্মানীতে বিশেষ ভাবেই পরিচিত। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে তিনি মিউনিক সামরিক জেলার অধিনায়ক হন। পোলাণ্ড এবং হল্যাণ্ড-বেলজিয়মে তিনি একাধিক জার্মান বাহিনী পরিচালিত করেন। ভাল যোদ্ধা হিসাবে জার্মানীতে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি আছে।

ত্রিধারা আক্রমণ

আগেই বলেছি রুশ-জার্মান যুদ্ধ বাধার পরই মিঃ চার্চিল সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রকে সাহায্যের আশ্বাস দেন এবং তদনুসারে একদল প্রতিনিধিও

মস্কোতে প্রেরিত হন। তাঁদের সঙ্গে আলোচনান্তে ১২ই জুলাই মস্কোতে বৃটেন ও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্যের চুক্তি হয়। চুক্তিতে মাত্র দু'টি ধারা থাকে। প্রথমটিতে বলা হয় যে, জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধচালনায় উভয় দেশ উভয় দেশকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবে এবং দ্বিতীয়ত, একের সম্মতি ব্যতীত অন্যে কোনরূপ সন্ধি বা যুদ্ধবিরতি করতে পারবে না ; এমন কি তজ্জন্য আলোচনাও চালান যাবে না।

এদিকে প্রথম চোটে কিছু এগিয়েই জার্মানবা আবার দাঁড়িয়ে খানিকটা দম নেয়। প্রায় ৪৮ ঘণ্টাকাল একরূপ নিস্তব্ধ থাকার পর ১২ই জুলাই রাত্রে জার্মান বাহিনী পুনরায় 'ব্লিৎসক্রীগ' বা ঝটিতি যুদ্ধ আরম্ভ করে। এবারের আক্রমণে তারা দক্ষিণ রণাঙ্গনে বেশী জোর না দিয়ে উত্তরে লেনিনগ্রাড এবং মধ্যাঞ্চলে মস্কোর দিকে অগ্রসর হবার জন্যই বেশী চেষ্টা করে। কিন্তু লেনিনগ্রাডের দিকে তারা তেমন বেশী সুবিধা করে উঠতে পারে না ; একমাত্র মস্কোর দিকেই তারা খানিকটা এগিয়ে যায় এবং ১৬ই জুলাই জার্মানরা স্মোলেনস্ক সহর দখলের দাবী করে।

জার্মানরা স্মোলেনস্ক পর্যন্ত গিয়ে হাজির হওয়ায় মধ্য রণাঙ্গনের অবস্থা সঙ্গীণ হয়ে ওঠে এবং মঃ ষ্ট্যালিন ২০শে জুলাই স্বহস্তে দেশরক্ষা সচিবের দপ্তরও গ্রহণ করেন।

প্রথম আক্রমণে জার্মানরা যত দ্রুত গতিতে অগ্রসর হয়েছিল দ্বিতীয় আক্রমণে তত দ্রুত অগ্রসর হতে না পারলেও লেনিনগ্রাডের দিকে প্রায় ৪০ মাইল এবং মস্কোর দিকে ১২০ মাইল তারা এগিয়ে যায়। ১৬ই জুলাই স্মোলেনস্ক সহর জার্মানদের হস্তগত না হলেও তাদের অগ্রগামী সাঁজোয়া বাহিনী সেপর্যন্ত গিয়ে হাজির হয়।

তারপর কিয়েফের দিকেও জার্মানরা আবার এগুবার চেষ্টা করে। তাদের একটি সাঁজোয়া বাহিনী কিয়েফের উপকণ্ঠে গিয়ে উপনীত হয়; কিন্তু লাল ফৌজ আবার তাদের পশ্চাতে হটিয়ে দেয়। কিয়েফের ৮৫ মাইল পশ্চিমে জিতোমীরকে কেন্দ্র করে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ চলে। দশ বার দিনের চেষ্টায় সেই অঞ্চলে



রুশ-জার্মান যুদ্ধ বাধার পর য়ুক্রেনের কৃষাণীরা মাঠ থেকে তাড়াতাড়ি খড় সংগ্রহ করছে।

জার্মানরা মাইল পঞ্চাশেক অগ্রসর হয়। তার দক্ষিণে হাঙ্গারীয় এবং রুমানীয় সৈন্যরা প্রায় শতখানেক মাইল এগিয়ে গিয়ে বুগ নদীর তীরে হাজির হয়। অবশ্য তারা বিনা বাধায় অগ্রসর হতে পারে নি।

তাদেরই ইস্তাহারে দেখা যায় যে, সোভিয়েট বাহিনী বিনাযুদ্ধে স্বচ্যগ্র ভূমিও ছেড়ে দেয় না।

স্মোলেনস্কের দিকে এগিয়েই জার্মানরা মস্কোর ওপর বিমান আক্রমণ চালাতে থাকে। ২১শে জুলাই রাত্রে প্রথম মস্কোতে বিমানহানা হয়। জার্মানীর প্রায় দু'শ বিমান সাড়ে পাঁচ ঘণ্টাকাল মস্কোতে হানা দেয়। জার্মানরা বলে যে, তাদের বিমান বাহিনী মস্কোতে কয়েকটি সামরিক লক্ষ্যের ওপর হানা দিতে সক্ষম হয়; কিন্তু সোভিয়েট পক্ষ তা অস্বীকার করে বলে যে, সেদিনের আক্রমণে কেবল অসামরিক অধিবাসীদেরই ক্ষতি হয়। তার পরদিনও রাত্রে আবার শ'দেড়েক জার্মান বিমান মস্কোতে হানা দেয় এবং কয়েক দিন এভাবে ক্রমাগত বিমান-আক্রমণ চলে। সোভিয়েট পক্ষ হতে বলা হয় যে, মস্কোর বাইরেই জার্মান বিমানবহর সোভিয়েট বিমান বাহিনীর আক্রমণে প্রতিবার ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে এবং মাত্র দু'চারখানি করে জার্মান বিমানের অতি কষ্টে সহরের ওপর পৌছা সম্ভব হয়।

স্মোলেনস্ক এলাকায় জার্মানরা সাঁড়াশীর ন্যায় দু'বাহু বিস্তার করে একটা বড় সোভিয়েট বাহিনীকে পরিবেষ্টনের মধ্যে ফেলে। সোভিয়েট সৈন্যরা তা ভেদ করে বেরুবার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে এবং তাতে উভয় পক্ষে সেখানে ঘোরতর যুদ্ধ বাধে। অবরুদ্ধ সৈন্যদের উদ্ধারের জন্য বার হতেও সোভিয়েট বাহিনী জার্মানদের ওপর চাপ দেয় এবং তাতে রণাঙ্গন ক্রমশ বিস্তার লাভ করে। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই বিষম ক্ষতি হয়; তবে যুদ্ধে জয়লাভ করে জার্মান বাহিনী। সোভিয়েট সৈন্যরা কিছু দূর সরে গিয়ে নতুন ব্যূহরচনায় বাধ্য হয়।

এভাবে ছয় সপ্তাহ গিয়ে সাত সপ্তাহ চলে এবং ইতিমধ্যে যুদ্ধের আবার মোড় ঘুরে যায়। স্মোলেনস্ক এলাকায় যুদ্ধে সুবিধা করার পর

জার্মানরা উত্তরে লেনিনগ্রাড এবং দক্ষিণে কিয়েফের অভিযানে বেশী জোর দেয়। বেসারাবিয়ার দিক হতে জার্মান ও রুমানীয় বাহিনী সোভিয়েট সেনার প্রবল বাধা অতিক্রম করে আর বেশী অগ্রসর হতে না পারায় কিয়েফ অঞ্চল হতে জার্মানদের একটি বাহু কৃষ্ণসাগর তীরবর্তী ওডেসা বন্দরে পৌছার চেষ্টা করে। তারা সোজাসুজি ওডেসার দিকে না গিয়ে পূর্বদিকে পৌছে ওডেসায় সোভিয়েট বাহিনীকে পশ্চাদ্দিক হতে আক্রমণের প্রয়াস পায়। ওদিকে নীষ্টার নদী পেরিয়ে জার্মান ও রুমানীয় সৈন্যরা সোজা ওডেসায় পৌছার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। জার্মানদের এই নতুন চালে দক্ষিণ য়ুক্রেনের যুদ্ধ অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

উত্তরে লেনিনগ্রাডের দিকে অভিযানে এস্তোনিয়া হতে জার্মানরা অগ্রসর হবার জন্য প্রবল ভাবে যুদ্ধ চালায়। অপর দিকে লাডোগা এবং ওনেগা হ্রদের মধ্যবর্তী এলাকায় ফিনরা অগ্রসর হয়ে সোভিয়েট ব্যূহ ভেদ ও ষ্ট্যালিন খাল দখলের চেষ্টা করে। অনেকেই তখন অনুমান করছিল যে, সেই খাল দিয়ে বল্টিক সাগর হতে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ তাঁদের বহু সাবমেরিণ উত্তরে সুমেরু এলাকায় পাঠাচ্ছিলেন। কাজেই ষ্ট্যালিন খালের গুরুত্ব তখন খুবই বেশী ছিল। সুমেরু অঞ্চলে সেই সময় সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ সৈন্য পাঠিয়ে শক্তিবৃদ্ধি করেন এবং বৃটিশ নৌবলও তখন সেখানে কিছু উপস্থিত হয়। ফিনল্যাণ্ডের পোতাশ্রয় পেটসামোর ওপর বৃটিশ বিমান হানা দেয়। মুরমানস্ককে কেন্দ্র করে উক্ত এলাকায় ভালভাবেই হানাহানি চলে।

য়ুক্রেনে জার্মানরা কিয়েফের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অনেকখানি অগ্রসর হয়ে বিলয়া টসারকফ পর্যন্ত গিয়ে পৌছে। কিয়েফ হতে তার দুরত্ব মাত্র ৫০ মাইল। সেখানে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। সেই

যুদ্ধে প্রচণ্ড ঘা খেয়ে জার্মানরা কিছুদিনের মত কিয়েফের দিকে অগ্রসর হওয়া বন্ধ রাখে এবং ওডেসার দিকে নজর দেয়। কিয়েফ ও ওডেসার যোগসূত্র ছিন্ন করার জন্য তারা বিশেষ ভাবে চেষ্টা করে এবং তাদের লক্ষ্য থাকে ওডেসার সোভিয়েট সৈনাকে কিভাবে য়ুক্রেনের মূল শক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায়।

কিয়েফের ১২৫ মাইল দক্ষিণে এবং ওডেসার ১৫০ মাইল উত্তরে উমানকে কেন্দ্র করে তখন এক প্রবল যুদ্ধ হয় এবং কয়েক দিনের মধ্যেই অগ্রগামী জার্মান বাহিনী ওডেসার ৭৫ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত নিকোলায়েফে গিয়ে পৌছে। তার ফলে ওডেসার সমূহ বিপদ দেখা দেয়। জার্মানদের এই নতুন অভিযান প্রতিরোধের জন্য মার্শাল বুদেনী আরো সৈন্য আনিয়ে শক্তিবৃদ্ধি করেন। সেই সময় বার্লিনের ওপর সোভিয়েট বিমান হানা দেয়। প্রথম দিন সোভিয়েট বিমান-যোদ্ধারা বার্লিনবাসীদের আগ্নেয় বোমা দিয়ে অভিবাদন জানায়। তারপর ক্রমাগত তিন চারদিন বার্লিনে বিমানহানা চলে এবং তাতে তারা উগ্র বিস্ফোরক বোমাও ফেলে। প্রথম দিকে সোভিয়েট বিমানহানায় বার্লিনরক্ষীরা রীতিমত বিব্রত হয়ে পড়েছিল। তারা ভেবেছিল, বার্লিনে কখনো বিমানহানা হলে পশ্চিম দিক থেকেই হবে এবং বৃটিশ বিমান গিয়েই তাদের উৎপাত করবে। অতদূর হতে সোভিয়েট বিমান যে তাদের ওপর গিয়ে হানা দিতে পারে সেটা তারা প্রথমে বুঝতেই পারে নি। পরে অবশ্য এসম্বন্ধে তারা হুশিয়ার হয়।

ছয় সপ্তাহের খতিয়ান

ছয় সপ্তাহের যুদ্ধে কি অপরিসীম ক্ষতি হয় এবার তার খানিকটা আভাষ দেওয়া যেতে পারে। ছয় সপ্তাহের যুদ্ধে রুশ রণাঙ্গনে যে

বিপুল লোকক্ষয় ও সমরোপকরণ বিনষ্ট হয়, তার আগে প্রায় দুই বর্ষব্যাপী যুদ্ধে সমগ্র য়ুরোপে তা হয় নি। এই ক্ষতির সঙ্গে অন্য কোন যুদ্ধের ক্ষতির তুলনাই হয় না। দুই প্রবল পরাক্রান্ত শক্তির সংঘর্ষ জগদ্বাসীকে বিস্মিত ও স্তম্ভিত করে তোলে।

আগেই বলেছি, যুদ্ধের ক্ষতি সম্বন্ধে উভয় পক্ষের বিবরণেই কতকটা অতিরঞ্জন থাকা সম্ভব। তাছাড়া যুদ্ধের সময় নির্ভুল হিসাব দেওয়া কারো পক্ষে সহজ নয়। কাজেই দু'পক্ষের বিবরণে যথেষ্ট অসঙ্গতি বিদ্যমান। কোন পক্ষের বিবরণই নির্বিচারে বিশ্বাস করা কঠিন; তবে উভয় পক্ষের বিবরণদৃষ্টে অন্তত একথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে যে, উভয়দিকেই ক্ষতি প্রচণ্ড রকমের হয়। অবশ্য উভয় পক্ষের বিবরণে কিছু পার্থক্যও না আছে এমন নয়। জার্মান বিবরণে প্রধানত তাদের প্রতিপক্ষের ক্ষতিরই হিসাব দেওয়া হয়; পক্ষান্তরে সোভিয়েট বিবরণে প্রতিপক্ষ ও স্বপক্ষ উভয় দিকেরই ক্ষতির হিসাব থাকে এবং তাদের সেই বিবরণে উভয় পক্ষের ক্ষতির হিসাবে আকাশ-পাতাল পার্থক্য দৃষ্ট হয় না; সাধারণ বিচারবুদ্ধিতে তা অপেক্ষাকৃত সংযত ও সঙ্গতিপূর্ণ বলা যেতে পারে। সে যাই হোক, সত্যাসত্য নিরূপণের চেষ্টা না করে উভয় দিকের বিবরণ উদ্ধৃত করাই এখানে সমীচীন। ৬ই আগষ্ট জার্মান হাই কমাণ্ডের এক ইস্তাহারে বলা হয়:—

"এপর্যন্ত জার্মানরা ৮ লক্ষ ৯৫ হাজার রুশ সেনাকে বন্দী করেছে। এতদ্ব্যতীত সোভিয়েট পক্ষের ১৩১৪৫টি সাঁজোয়া গাড়ী, ১০৩৮৮টি কামান এবং ৯০৮২টি বিমান খোয়া গিয়েছে।"

আর একটু বিস্তারিত বিবরণে বলা হয় যে, এস্তোনিয়ার দিকে যুদ্ধে ৩৫ হাজার রুশ সেনা বন্দী হয় এবং সোভিয়েটের ৩৫৫টি ট্যাঙ্ক, ৬৫৫টি কামান এবং ৭৭১টি বিমান খোয়া যায়। দক্ষিণে বেসারাবিয়া

পার হয়ে কিয়েফের দিকে যে অভিযান চলে তাতে দেড় লক্ষ রুশ সেনা বন্দী হয় এবং সোভিয়েটকে ১৯৭০টি সাঁজোয়া গাড়ী, ২১৯০টি কামান এবং ৯৮০টি বিমান হারাতে হয়। তারপর স্মোলেনস্কের যুদ্ধে রুশ সেনা বন্দীই হয় প্রায় ৩ লক্ষ ১০ হাজার; তাদের কামান খোয়া যায় ৩২০৫টি এবং ওই একই রণক্ষেত্রে সোভিয়েট বিমান বিধ্বস্ত হয় ১৩৯৮টি।

এর পাল্টা জবাবে সোভিয়েট পক্ষ হতে ৮ই আগষ্ট এক বিবৃতি দিয়ে বলা হয় যে, জার্মান হাই কমাণ্ডের দাবী উদ্ভট। সোভিয়েট বিবৃতিতে উভয় পক্ষের ক্ষতির হিসাব নিম্নরূপ দেওয়া হয়:—

ছয় সপ্তাহের যুদ্ধে নিহত, আহত ও বন্দী ধরে জার্মানীকে পনর লক্ষাধিক যোদ্ধা হারাতে হয়। সোভিয়েটের খোয়া যায় প্রায় ৬ লক্ষ লোক। লাল ফৌজ জার্মানদের ৬ হাজারেরও অধিক ট্যাঙ্ক বিধ্বস্ত ও হস্তগত করে। সোভিয়েটের খোয়া যায় প্রায় ৫ হাজার ট্যাঙ্ক। লালফৌজ কর্তৃক বিধ্বস্ত ও হস্তগত জার্মান কামানের সংখ্যা ৮ হাজারেরও বেশী; সোভিয়েটের খোয়া যায় প্রায় ৭ হাজার কামান। জার্মানীর ৬ হাজার বিমান খোয়া যায়, আর সোভিয়েট হারায় প্রায় ৪ হাজার বিমান।

এতদ্ব্যতীত সোভিয়েট বিবৃতিতে আরো বলা হয় যে, 'ষ্ট্যালিন লাইন' জার্মানদের আবিষ্কার বিশেষ। জার্মানরা যেরূপ প্রচার করে প্রকৃত প্রস্তাবে সেরূপ কোন বিশেষ 'লাইন' বা দুর্গমালার অস্তিত্ব সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে নেই। তবে প্রয়োজন বোধে স্থান বিশেষকে সুরক্ষিত করা হয়েছে একথা সত্য, কিন্তু তাকে ফ্রান্সের ম্যাজিনো লাইন, জার্মানীর সিগফ্রিড লাইন বা ফিনল্যাণ্ডের ম্যানার-হাইম লাইনের পর্যায়ে ফেলা বাতুলতা মাত্র। জার্মানরা এই সাফাই

গায় কেবল নিজেদের দুর্বলতা ঢাকবার জন্য। রণাঙ্গনে সোভিয়েট বাহিনীর দৃঢ়তাই হল যথার্থ 'ষ্ট্যালিন লাইন'।

প্রসঙ্গান্তরে না গিয়ে এবার রুশ-জার্মান যুদ্ধে জার্মানীর ক্ষতি সম্বন্ধে মার্কিন সূত্রে প্রাপ্ত একটি হিসাব দিয়ে বক্তব্য শেষ করা যাক।



লাল ফৌজের একদল বিমানসেনা জার্মান বিমান বাহিনীর সঙ্গে সারাদিন লড়াইয়ের পর তাদের নায়ককে যুদ্ধের ফলাফল জানাচ্ছে।

জার্মানীর গুপ্ত সরকারী দলিলপত্র হতেই নাকি কোন ভাবে এই হিসাব পাওয়া যায়। ১১ই জুলাই পর্যন্ত হিসাবে দেখা যায়, প্রথম সপ্তাহে নিহত, আহত ও বন্দী ধরে জার্মানী প্রতিদিন ৪০ হাজার করে লোক হারায়। এতদ্ব্যতীত সেই সপ্তাহে তাদের মোট ৪৫০টি ট্যাঙ্ক ও ৫৫০টি বিমান খোয়া যায়।

যুদ্ধের দ্বিতীয় সপ্তাহে আরো বেশী ক্ষতি হয়। মোট ৩ লক্ষ ৬০ হাজার লোক, সাত আট শত ট্যাঙ্ক, ৭৫০টি বিমান জার্মানীর হারাতে হয়। তৃতীয় সপ্তাহে তার খোয়া যায় ৩ লক্ষ ৫০ হাজার লোক, ৭০০ ট্যাঙ্ক ও ৮০০ বিমান।

অতএব এই তিন সপ্তাহের যুদ্ধে জার্মানীকে মোট প্রায় ১০ লক্ষ লোক, ১৯০০ ট্যাঙ্ক এবং ২০০০ বিমান হারাতে হয়।

ওডেসায় চাপ

দক্ষিণ দিকে কয়দিনে জার্মানরা আরো এগিয়ে যায়। ওডেসা বন্দর ও বুগ নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল দিয়ে তারা কৃষ্ণসাগরের তীর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। জার্মান ইস্তাহারে বলা হয় যে, রুমানীয় বাহিনী ওডেসা ঘিরেছে এবং জার্মান ও হাঙ্গারীয় বাহিনী নিকোলায়েফ পরিবেষ্টিত করেছে। খারসনের উত্তর-পশ্চিমে প্রসিদ্ধ লৌহখনির অঞ্চল ক্রিভয়-রগ দখল করেছে বলেও জার্মানরা দাবী জানায়। এছাড়া সোভিয়েট পক্ষ হতে স্বীকার করা হয় যে, নিকোলায়েফের উত্তর-পশ্চিমে বুগ নদীর তীরে অবস্থিত কিরোভগ্রাড ও পারভোমেস্ক সহর হতে রুশ সৈন্য সরান হয়েছে। সোভিয়েট পক্ষ সেই সময় নীপার নদীর বাঁকে নতুন ব্যূহ রচনা করে।

উত্তরে লেনিনগ্রাডমুখী অভিযানে জার্মানরা ষ্টারয়া-রাশায় গিয়ে পৌঁছে। তার উত্তরেই ইলমেন হ্রদ এবং সেই হ্রদের উত্তরে লেনিন-গ্রাড। ইলমেন হ্রদ থাকায় এবং ইলমেন হ্রদ ও লেনিনগ্রাডের মধ্যবর্তী অঞ্চল জলা হওয়ায় জার্মানরা সেই পথে লেনিনগ্রাড দখলে আর অগ্রসর না হয়ে ষ্টারয়া-রাশা হতে প্রায় ৬০ মাইল পূবে লেনিনগ্রাড-মস্কো রেলপথ বিচ্ছিন্ন করতে উদ্যত হয়।

স্মোলেনস্ক দখলের পর জার্মানরা কিছুকাল সেখানে আক্রমণ না চালিয়ে আত্মরক্ষার নীতি অবলম্বন করে এবং লেনিনগ্রাড ও যুক্রেনের দিকে ক্রমাগত চাপ বাড়ায়। আগষ্ট মাসের তৃতীয় সপ্তাহে খবর পাওয়া যায় যে, যুক্রেন রণাঙ্গনে জার্মানী প্রায় পনর লক্ষ সৈন্য নিয়োজিত করেছে। ৪০ হতে ৫০টি জার্মান পদাতিক ডিভিসন, ৪৫টি পানৎসার ডিভিসন এবং জার্মানীর পক্ষাবলম্বী রাষ্ট্রসমূহের ৪৫ থেকে ৫০ ডিভিসনে সেই পনর লক্ষ সৈন্য বিভক্ত।

আগেই বলেছি, ওডেসা বন্দর পরিবেষ্টিত করে জার্মানরা উক্ত অঞ্চলে বেশ খানিকটা সুবিধা করে নেয়। ১৮ই আগষ্ট পাকা খবর পাওয়া যায় যে, ওডেসার উত্তর-পূর্বদিকস্থ প্রসিদ্ধ বন্দর নিকোলায়েফ এবং তার একশ' মাইল উত্তর-পূর্বে ক্রিভয়-বগেব পতন হয়েছে। সোভিয়েট পক্ষ হতে বলা হয় যে, নিকোলায়েফ বন্দর ও ক্রিভয়-রগ ত্যাগের প্রাক্কালে লাল ফৌজ প্রতিপক্ষের প্রায় বিশ হাজার সৈন্য হতাহত করে যায়। এছাড়া নিকোলায়েফের পোতাশ্রয়ও উড়িয়ে দেওয়া হয়। জার্মানরা দাবী করে যে, নিকোলায়েফ বন্দরে তারা সোভিয়েট পক্ষের ৩৫ হাজার টনের একখানি ব্যাটল্‌শিপ, দশ হাজার টনের একখানি ক্রুজার, চারখানি ডেষ্ট্রয়ার এবং দুটি সাবমেরিণ হস্তগত করেছে।

এর উত্তরে সোভিয়েট পক্ষ হতে বলা হয় যে, নিকোলায়েফ জাহাজখানায় একখানি নতুন ব্যাটল্‌শিপ ও ক্রুজার ছিল বটে, তবে নির্মাণকার্য শেষ না হওয়ায় কোনটিতেই এঞ্জিন বসান হয়েছিল না। সোভিয়েট সেনা ডক উড়িয়ে দেবার কালে জাহাজ দু'খানিও উড়িয়ে দিয়ে যায়।

লেনিনগ্রাডের দিকে জার্মান ও ফিন বাহিনীর অভিযানের বেগ-

বৃদ্ধি লাল ফৌজের পক্ষে কিছু আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এস্তোনিয়া হতে পিপাস হ্রদের দুধার দিয়ে জার্মান বাহিনী অগ্রসর হয়ে উত্তরদিকস্থ বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়। পিপাস হ্রদ ও বল্টিক সাগরের মধ্যবর্তী ত্রিশ মাইল প্রশস্ত ভূভাগে জার্মান বাহিনী আধিপত্য লাভ করায় এস্তোনিয়ায় সোভিয়েট সৈন্যরা তাদের মূল বাহিনী হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। উত্তর দিকেও ফিন বাহিনী লাডোগা হ্রদ এবং ওনেগা হ্রদের মধ্যবর্তী অঞ্চলে কয়েক স্থানে মূল সোভিয়েট সীমান্ত অতিক্রম করে। কাজেই লেনিনগ্রাডের দিকে যুদ্ধটা বেশ জটিল হয়ে ওঠে। মার্শাল ভরোশিলফ প্রায় দশ লক্ষ সৈন্য নিয়ে লেনিনগ্রাড রক্ষার জন্য প্রস্তুত হন। লেনিনগ্রাডের পঞ্চাশ মাইল দূরে সোভিয়েট বহির্ব্যূহ রচিত হয়।

কেবল তাই নয়। স্মোলেনস্ক এবং কিয়েফের মাঝামাঝি স্থানে নীপার নদীর পূর্বতীরে প্রসিদ্ধ রেলওয়ে ষ্টেসন গোমেলকে কেন্দ্র করেও যুদ্ধ বেশ প্রবল হয়ে ওঠে। তুমুল যুদ্ধের পর সোভিয়েট সৈন্যরা গোমেলত্যাগে বাধ্য হয়। জার্মানরা আরো এগিয়ে গোমেলের উত্তর-পূর্ব দিকে দেড়শ' মাইল দূরে ব্রিয়ানস্ক পর্যন্ত যায়। ব্রিয়ানস্ক হতে মস্কোর দূরত্ব খুব বেশী নয়। কাজেই তারা সেখান থেকে মস্কোর দিকে যাবে কি কিয়েফের দিকে ধাওয়া করবে, তা নিয়ে সোভিয়েট পক্ষকে কিছু দুর্ভাবনার মধ্যে পড়তে হয়। দক্ষিণে নীপার নদীর মুখে খারসন বন্দরও জার্মানরা দখল করে নেয়। ফলে স্থলপথে ওডেসা একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। একমাত্র জলপথে কৃষ্ণসাগরীয় সোভিয়েট নৌবাহিনী ওডেসারক্ষীদের রসদ যোগাতে থাকে। অপর দিকে কৃষ্ণসাগরের তীর হতে দু'শ' মাইল উজানে নীপার নদীর পশ্চিম পারে অবস্থিত প্রসিদ্ধ লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা নিপ্রোপেট্রোভস্ক

দখলের জন্য জার্মানরা মরিয়া হয়ে লাগে। তুমুল যুদ্ধের পর সেই সোভিয়েট ইস্পাতনগরী নিপ্রোপেট্রোভস্কও তারা দখল করতে সমর্থ হয়। তার দক্ষিণে নীপারের ওপর যে বিরাট বাঁধ ছিল তা সোভিয়েট



রণাঙ্গনের পশ্চাতে সোভিয়েট কৃষকরা সরকারী ভাণ্ডারে সাহায্যের জন্য তাদের ঘর থেকে খাদ্য গাড়ী বোঝাই করে নিয়ে যাচ্ছে।

সৈন্যরা ভেঙ্গে দেয়। ফলে নিপ্রোপেট্রোভস্কের লৌহ ও ইস্পাতের কারখানায় জন্য যে হাইড্রো-ইলেকট্রিকের ব্যবস্থা ছিল তা অচল হয়ে যায়। ভাঁটির দিকে নীপার তীরবর্তী অঞ্চল একেবারে চাষের

অযোগ্য হয়ে পড়ে। সোভিয়েট বাহিনী কর্তৃক এই 'পোড়ামাটি' নীতি অবলম্বনের ফলে এত সমস্ত দখল করেও জার্মানরা তেমন লাভবান হতে পারে না।

রুশ-জার্মান যুদ্ধের দশ সপ্তাহের ফলাফল বিচার করলে দেখা যায়, স্থলবিশেষে জার্মানদের প্রচণ্ড আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে সোভিয়েট বাহিনী পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয় সত্য; কিন্তু কোনক্ষেত্রেই প্রতিপক্ষের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ না করে তারা স্থানত্যাগ করে না এবং বিনা শক্তিক্ষয়ে কোনস্থলেই প্রতিপক্ষকে তারা অগ্রসর হতে দেয় না। প্রয়োজন হলে তারা পশ্চাদপসরণ করে, তবে যাওয়ার আগে যদ্দূর সম্ভব তারা শত্রুর ক্ষতি করে যায়। এছাড়া কোন স্থানত্যাগের পূর্বে তাদের 'পোড়ামাটি' নীতি অবলম্বনের ফলে পরিত্যক্ত স্থান এমন অবস্থায় পরিণত হয় যার ফলে বিপক্ষের সৈন্যরা এসে সেখানে কোনই সুবিধা করতে পারে না। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে জার্মান বাহিনী কর্তৃক য়ুরোপের পশ্চিম রণাঙ্গনে অর্থাৎ ফ্রান্স, বেলজিয়ম ও হল্যাণ্ড দখলের কালে কিন্তু ঠিক এর বিপরীত অবস্থা হয়েছিল। সেখানে জার্মান বাহিনী একরূপ অবিরাম ও অব্যাহত গতিতে অগ্রসর হয়ে যেসকল স্থান অধিকার করে সেই সকল স্থানের কৃষিজাত ও খনিজ সম্পদ এবং কলকারখানাগুলি হাতে পাওয়ায় জার্মানীর যথেষ্ট সুবিধা হয়ে যায়। সেখানকার যোদ্ধারা যে সর্বত্র ইচ্ছা করেই সেই সব সম্পদ শত্রুর জন্য পশ্চাতে ফেলে রেখে যায় এমন নয়; প্রবল পরাক্রান্ত প্রতিপক্ষের আক্রমণে তিষ্ঠিতে না পেরেই অতীব অপ্রস্তুত অবস্থায় সব ফেলে রেখে তাদের পশ্চাদপসরণ করতে হয়। সেই অবস্থায় পশ্চাদপসরণ পলায়নেরই নামান্তর মাত্র। পলায়নপর বাহিনীর পক্ষে খেয়াল রাখা সম্ভব নয় যে, শত্রুর হাতে কি পড়বে না পড়বে। কিন্তু রুশ রণাঙ্গনের অবস্থা

সম্পূর্ণ অন্তরূপ। সেখানে উভয়পক্ষই প্রবল; কেউ কারো ভয়ে পালাবার নয়। আধুনিক যুদ্ধের কৌশল উভয় পক্ষেরই সমান আয়ত্ত এবং ঘাত-প্রতিঘাতে উভয়ই সমকক্ষ। সুতরাং প্রতিপাদ ভূমির জন্য সোভিয়েট বাহিনী বিপক্ষের সঙ্গে লড়তে সমর্থ হয় এবং কোন স্থান-ত্যাগের কালে তারা সেখানকার সমস্ত নষ্ট করে দিয়ে যেতে পারে। আত্মরক্ষার যথেষ্ট শক্তি না থাকলে হয়ত য়ুরোপের পশ্চিম রণাঙ্গনের মত রুশ রণাঙ্গনেও জার্মান 'ব্লিৎজক্রীগের' মুখে পড়ে সোভিয়েট বাহিনীকে পশ্চাদপসরণের সময় সম্পদরাশি ফেলে রেখে যেতে হত এবং সেগুলি লাভ করে জার্মানীর সমরসামর্থ্য আরো বেড়ে যেত। কিন্তু সোভিয়েট সৈন্যরা তাদের প্রতিপক্ষের সেই আশা নিষ্ফল করে দেয়। কেবল লাল ফৌজই নয়; সোভিয়েট জনসেনা গেরিলাযুদ্ধের কৌশলে একাজে কতখানি সহায়তা করে, এবার সেই সম্বন্ধেই কিছু বলব।

জনযুদ্ধ

আধুনিক 'টোটাল ওয়ার' বা সার্বিক যুদ্ধ যে কেবল বেতনভুক সৈন্য-দেরই ব্যাপার নয় তা ভালভাবে প্রমাণ করেছে সোভিয়েট জনসেনা। সেখানে চাষীমজুর পর্যন্ত স্বেচ্ছায় অস্ত্রধারণ করেছে এবং বিজিত অঞ্চলে সেই জনসেনা গেরিলা কৌশলে খণ্ডযুদ্ধ চালিয়ে প্রতিপক্ষকে নানাভাবে বিব্রত করে তুলেছে। তারই ফলে সোভিয়েট যুদ্ধ যথার্থ জনযুদ্ধে পরিণত হয়েছে। রণাঙ্গনের পশ্চাতে সোভিয়েট গেরিলাদের ভয়ে জার্মানরা সদা সন্ত্রস্ত।

কিছুদিন আগে 'নিউজ ক্রনিকল্' পত্রিকার সমর-সংবাদদাতা মিঃ

ফিলিপ জর্ডন তার রুশ রণাঙ্গনে লব্ধ সাত মাসের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে এক বক্তৃতায় বলেন :—

"মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে অন্তত এক দেশের সেনাপতিমণ্ডলী জনযুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা যথার্থ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং তা পেরেছিলেন বলেই চিন্তাধারাকে বাস্তবে পরিণত করে তাঁরা যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছেন ; তা না হলে এতটা সাফল্য লাভ করা হয়ত তাঁদের পক্ষে সম্ভব হত না। এই সেনাপতিমণ্ডলী হলেন রুশ সেনাপতিমণ্ডলী। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন, যুদ্ধ আমার, আপনার এবং সকলের। কাজেই তাঁরা গেরিলাদল গঠনে জনসাধারণকে নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন এবং সাহায্য যুগিয়েছেন। রুশিয়ায় এই জনযোদ্ধারা 'পার্টিজান' নামে পরিচিত।"

রুশ-জার্মান যুদ্ধ বাধবার আগেই সোভিয়েট সামরিক কর্তৃপক্ষ বুঝতে পেরেছিলেন যে, জার্মানরা কখনো আক্রমণ করলে লাল ফৌজকে প্রথমে খানিকটা পশ্চাতে হটে আসতেই হবে এবং তারপর তারা পাল্টা আক্রমণ চালাবার সুবিধা পাবে। একথা তাঁদের জানা ছিল বলেই লাল ফৌজের সেনানীরা গ্রাম হতে গ্রামান্তরে এবং সহর হতে সহরান্তরে গিয়ে গেরিলা-বাহিনী গড়ে তোলেন। প্রত্যেক স্থানেই গেরিলাদের নেতৃত্ব দেওয়া হয় প্রধানত গ্রামের মোড়ল অথবা স্থানীয় কোন গণপ্রতিষ্ঠানের কর্তার ওপর। সোভিয়েট সেনানীরা কেবল গেরিলাদল সংগঠন করেই ছেড়ে দিলেন না ; তারা বনেজঙ্গলে এবং গুপ্তস্থানে খাদ্য ও অস্ত্রশস্ত্র মাটির নীচে পুঁতে রেখে গ্রামবাসী ও ছোট ছোট সহরের অধিবাসীদের বললেন, "তোমাদের জন্য এই রসদ ও অস্ত্র মাটির নীচে সঞ্চিত রইল। শত্রু এলে যেভাবে পার তাদের জীবন দুর্বিসহ করে তুলো। তাছাড়া আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখো।"

রুশ-জার্মান যুদ্ধ বাধলে সোভিয়েট গেরিলারা সত্যই জার্মানদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলল। অধিকৃত এলাকায় গেরিলা-যোদ্ধারা কোথাও জঙ্গলে কোথাও পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিল। জার্মানদের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হবার মত শক্তি গেরিলাদের নেই; কাজেই রাত্রির অন্ধকারে আত্মগোপন করে তারা জার্মানদের ট্যাঙ্কাশ্রয়, রেজিমেণ্টের প্রধান শিবির প্রভৃতিতে আচমকা হানা দিয়ে বিস্তর ক্ষতি করতে লাগল। কেবল তাই নয়, জার্মানদের যোগাযোগপথে



সোভিয়েট নারী গেরিলা যোদ্ধা। কাস্তে ফেলে এই সব কৃষকরমণী রাইফেল ধরেছে।

আক্রমণ চালিয়ে তারা তাদের বিষম বিব্রত করে তুলল; এমন কি রসদ ও অস্ত্র বোঝাই জার্মান ট্রেনগুলিকে পর্যন্ত তারা লাইনচ্যুত করে ফেলতে লাগল।

সোভিয়েট গেরিলারা কেবল যে রাত্রেই আক্রমণ করে এমন নয়, দিনের বেলা ঝোপঝাড় হতে অকস্মাৎ বেরিয়েও তারা সুযোগ পেলে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করে। সব সময় সকলের রাইফেলও জোটে না,

দা কাস্তে, খন্তা কুডুল, যার যেমন অস্ত্র জোটে তেমন অস্ত্র নিয়েই তারা প্রতিপক্ষকে ঘা দিতে অগ্রসর হয়। হাতের কাছে মানুষ মারার যে কোন একটা অস্ত্র তাদের পেলেই হল।

সোভিয়েট গেরিলাদের এরূপ আক্রমণের ফলে জার্মানরা আর যে-সে পথে সরবরাহ পাঠাতে পারে না; একমাত্র বড় বড় রাজপথ দিয়েই 'কনভয়' করে তারা সরবরাহ পাঠাতে বাধ্য হয়। তাতে সোভিয়েট বিমান বাহিনী জার্মান সরবরাহের ওপর আক্রমণ চালাতে যথেষ্ট সুবিধা পায়; কিন্তু জার্মানরা সোভিয়েট সরবরাহের ওপর বিমানহানা দিতে ততখানি সুবিধা পায় না। উপরন্তু সোভিয়েট গেরিলাদের আক্রমণে জার্মানরা এতটা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে যে, অধিকৃত এলাকায় প্রত্যেক সরবরাহকেন্দ্রে তারা রক্ষীর সংখ্যা বিস্তর বাড়িয়ে দিতে বাধ্য হয়। এটাও জার্মানীর পক্ষে একটা কম অসুবিধার কথা নয়। রণাঙ্গনের পশ্চাতে এভাবে পাহারার জন্য রক্ষীর সংখ্যা অস্বাভাবিক ভাবে বাড়াতে না হলে জার্মানী অনায়াসেই যুদ্ধক্ষেত্রে আরো বেশী সৈন্য নিয়োজিত করতে পারত; কিন্তু সোভিয়েট গেরিলাদের অতর্কিত আক্রমণ হতে নিজ রসদ ও সরবরাহরক্ষার জন্য জার্মানীকে তার সুশিক্ষিত সৈন্যদলের একটা বড় অংশ কেবল পাহারার কাজে নিযুক্ত রাখতে হয়। এভাবে সোভিয়েট গেরিলারা রণক্ষেত্রে সপক্ষের বাহিনীর ওপর প্রতিপক্ষের বাহিনীর চাপ খানিকটা হ্রাস করে।

তারপর অধিকৃত সোভিয়েট এলাকায় গেরিলাদের ভয়ে জার্মান সৈন্যদের মনোবল কতখানি ক্ষুণ্ণ হয় তাও ভাববার বিষয়। তাদের সদাই ভয়—এই বুঝি এল। যে কোন মুহূর্তে গুপ্ত আক্রমণে তাদের প্রাণ যেতে পারে। গুপ্ত ঘাতকের ছোরা যে কখন বক্ষে বিদ্ধ হবে তার কিছু ঠিক নেই। অধিকৃত সোভিয়েট এলাকায় জার্মানদের ঠিক

এই অবস্থায়ই কাটাতে হয়। ঘুমোতে গিয়েও তারা নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোতে পারে না। অন্ধকারে কখন সোভিয়েট নরনারী—এমন কি বালকবালিকা পর্যন্ত এসে অকস্মাৎ তাদের বিশ্রামাগারে হানা দেবে এবং পালাবার চেষ্টা করলে বুকে ছুরি বসিয়ে দেবে অথবা গুলী করবে—ঠিক কি? এ অবস্থায় কারো মনোবল ঠিক থাকতে পারে না। মিঃ ফিলিপ জর্ডন বলেন:—"রুশিয়ায় আমি জার্মান বন্দীদের মধ্যে অনেককে বলতে শুনেছি যে, ক্রমাগত গেরিলাদের ভয়ে থাকার চাইতে তারা বরঞ্চ পালিয়ে এসে বন্দী হয়ে ভালই আছে।"

এ থেকেই বোঝা যায়, রণক্ষেত্রের পশ্চাতে সোভিয়েট গেরিলারা প্রতিপক্ষের মধ্যে কতখানি বিভীষিকা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।

এর চেয়ে আরো বড় কাজ গেরিলাদের রয়েছে। সোভিয়েট গেরিলারা নিয়মিতভাবে শত্রুর খবরাদি সংগ্রহ করে সপক্ষের সৈন্যদলকে সেগুলি যোগায়। শত্রু যে-এলাকায় অবস্থান করে গেরিলারাও সেই এলাকায়ই থাকে। পথঘাট তাদের সবই জানা। কাজেই শত্রুর খবরাদি সংগ্রহ করা তাদের পক্ষে সহজ। এমন কি অনেক সময় গা ঢাকা দিয়ে তারা বিপক্ষের সলাপরামর্শ পর্যন্ত শুনে নেয় এবং শুনে নিয়ে তারা তা সপক্ষে পৌছায়। অনেক সময় তারা বিপক্ষের রেজিমেণ্ট ও ডিভিসনের প্রধান শিবিরে হানা দিয়ে মানচিত্র ও গুপ্ত দলিলপত্রাদি হাত করে এবং অবিলম্বে সেগুলি লাল ফৌজের প্রধান শিবিরে পাঠায়। কোন কোন গেরিলার সঙ্গে ছোট বেতার-প্রেরকযন্ত্র থাকে এবং তার সাহায্যে তারা স্বপক্ষে খবর দেয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা হাতে হাতে চিঠিপত্র পাঠায়। এই খবর পৌছাবার কাজেই বালকবালিকারা সাহায্য করে বেশী। অন্ধকারে তারা শত্রুপক্ষের ব্যূহ পেরিয়ে গিয়ে স্বপক্ষের শিবিরে খবর পৌছিয়ে

আসে এবং তাদের মারফৎই আবার লাল ফৌজের কর্তারা গেরিলাদের নতুন নির্দেশ পাঠান। এই সব সংবাদবাহকরা অনেক সময় পকেট ভরতি করে রাইফেলের গুলীও নিয়ে আসে। এই কাজটা যত কঠিন বলে মনে হচ্ছে তত কঠিন নয়। সুদীর্ঘ রুশ রণাঙ্গনে সর্বত্রই যে কাতারে কাতারে সৈন্য মোতায়েন রয়েছে এমন মনে করা ভুল। ঘাঁটিগুলির মাঝে মাঝে খানিকটা করে ফাঁক থাকেই। সেই সব ফাঁক দিয়েই অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে সংবাদবাহকরা যাতায়াত করে। অবশ্য কোন জরুরী প্রয়োজন উপস্থিত হলে সোভিয়েট গেরিলারা জার্মান ঘাঁটির কাছ দিয়েও যেতে ইতস্তত করে না; সেক্ষেত্রে সমস্ত বিপদকেই তারা বরণ করে নেয়। সোভিয়েট গেরিলাদের প্রধান নীতিই হল এই যে, যেখানে তাদের বাস সেখানে থেকেই তারা শেষ পর্যন্ত লড়বে; বেতনভুক সরকারী সৈন্যদের মত তারা স্থান হতে স্থানান্তরে যাবে না। অধিকাংশই তাদের কৃষক এবং আজীবন তারা সেখানে বাস করে আসছে। কাজেই প্রতিটি পথঘাট, নদীনালা, গাছপালা এবং ঝোপঝাড় তাদের একেবারে নখদর্পণে ভাসে। জার্মানদের পক্ষে তা জানা অসম্ভব। কাজেই সোভিয়েট গেরিলারা শত্রুর চক্ষে সহজেই ধূলি দিতে পারে।

কোন সোভিয়েট সৈন্য যখন তার দল হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তখন গেরিলারা তাকে আবার দলে ফিরে যেতে সাহায্য করে। আর তা না হলে কখনো কখনো তারা তাকে নায়করূপে নিজেদের মধ্যে রেখে.দেয়।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের এই জনসেনার কৃতিত্বের কথা বলতে গিয়ে মিঃ ফিলিপ জর্ডন বলেছেন :—

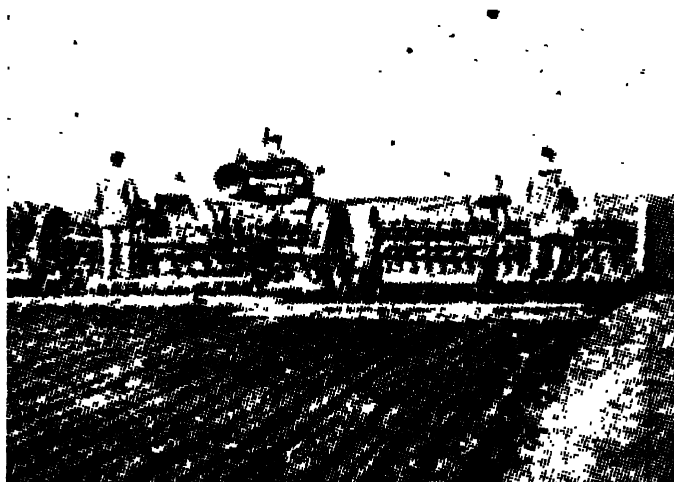
"প্রেরণা পেলে ভারতীয়দের পরিচালনায় এবং ভারতীয়দের শিক্ষায়

এক শক্তিশালী ভারতীয় গেরিলা-বাহিনী রাতারাতি গড়ে না ওঠবার কোন কারণ নেই।"

ভারতে গেরিলা-বাহিনী অর্থাৎ জনসেনা গড়ে তোলবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দ্বিমত করার কিছুই থাকতে পারে না। গেরিলা-বাহিনী গঠনের পক্ষে ভারতবর্ষ যে প্রশস্ত ক্ষেত্র ইতিহাসেও তার নজির রয়েছে। শিবাজী গেরিলা-বাহিনীর সাহায্যেই এক সময় বিরাট মোগল বাহিনীকে অস্থির করে তুলেছিলেন। কিন্তু গেরিলা-বাহিনী অর্থাৎ জনসেনা গঠন করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন জনসাধারণের গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা এবং জনসাধারণের প্রতি গবর্ণমেণ্টের আস্থা স্থাপন। সেই আস্থা স্থাপন করে বিদেশী শাসকগণ কি ভারতের জনসাধারণের হাতে অস্ত্র তুলে দিতে পারবেন?

সোভিয়েট গেরিলারা কিভাবে "পোড়ামাটি" নীতি সার্থক করে তোলে, এবার তৎসম্পর্কে কিছু বলা যাক। একটি গ্রামের দৃষ্টান্ত দিলেই তার খানিকটা বোঝা যাবে। য়ুক্রেনে জার্মান অভিযানের সময় কোন একটি গ্রামের লোক যখন জানতে পারল যে, নাৎসীরা তাদের গ্রামের দিকে এগিয়ে আসছে তখন গ্রামের অল্পবয়স্করা দল বেধে শস্যভাণ্ডার খালি করে নিকটবর্তী রেলষ্টেসনে সমস্ত শস্য নিয়ে গিয়ে মালগাড়ীতে তা চাপিয়ে দিল। ট্রেণ সেগুলি রণাঙ্গনের পিছনে নিয়ে গেল। পঞ্চাশ ষাট মণ শস্য আর স্থানান্তরে পাঠান সম্ভব হল না। গ্রামবাসীরা আগুন লাগিয়ে তা পুড়িয়ে ফেলল। যৌথ খামারের কৃষাণীরা তাদের গরুবাছুর ফলন্ত ক্ষেতে ছেড়ে দিয়ে সমস্ত খাইয়ে দিল। যে ফসল কাটবার মত হয়েছিল সেগুলিকে কেটে মাড়াই করে স্থানান্তরে পাঠাবার মত সময় ছিল না। কাজেই কৃষাণীরা কাস্তে দিয়ে সেগুলি কেটে তার ওপর দিয়ে ট্র্যাক্টর চালিয়ে সেগুলিকে এমন ভাবে মাটির সঙ্গে

মিশিয়ে দিল যে, কারো আর তা কুড়িয়ে পাবার উপায় রইল না। আলু, গাজর প্রভৃতির ক্ষেতগুলি চষে তারা একেবারে নষ্ট করে দিল। শূকরগুলি কেটে ধারেকাছে যেসব লাল ফৌজ ছিল তাদের দিয়ে দেওয়া হল। শূকর ও ঘোড়ার আস্তাবল এবং গোয়ালগুলি ভেঙ্গে ফেলা হল। ভাল ঘোড়াগুলিকে গেরিলা-যোদ্ধাদের ব্যবহারের জন্য জঙ্গলের দিকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। কেবল তাই নয়, চাষের সমস্ত



একটি যৌথ খামারে জার্মানদের আসবার আগে সোভিয়েট কৃষকরা ট্র্যাক্টর চালিয়ে মাটির সঙ্গে ফসল মিশিয়ে দিচ্ছে।

যন্ত্রপাতি গ্রামবাসীরা ভেঙ্গে ফেলল, তাদের স্থানীয় চিনির কলটিকে তারা ধূলিসাৎ করে দিল। এমন কি কোন পুকুরে পর্যন্ত তারা একটি মাছ রাখল না। দোকানের জিনিসপত্র যা পারল তারা পিছনে সরিয়ে বাকীটা নষ্ট করে দিল। কুয়োগুলি তারা ভরাট করে ফেলল এবং গ্রাম থেকে শিশু ও বালকবালিকাদের সরিয়ে দিয়ে গ্রামবাসীরা

প্রতিপক্ষের সঙ্গে গেরিলা কৌশলে যুদ্ধ করবার জন্য নিকটবর্তী বনে-জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিল।

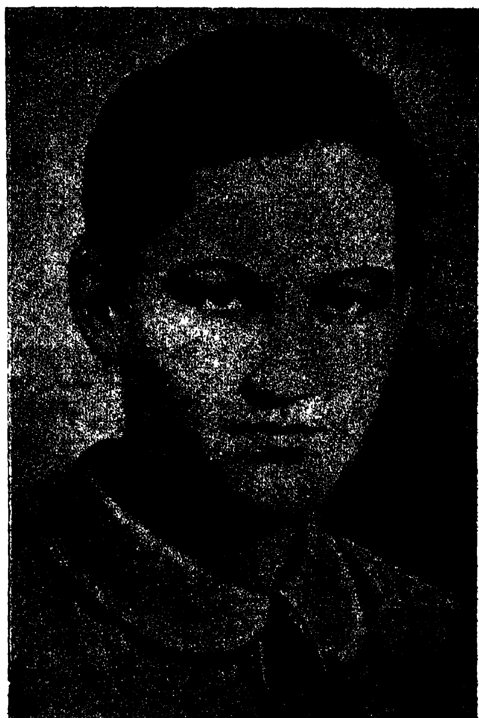
কেবল গ্রাম নয়, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে সহরগুলিকেও শত্রুর হাতে পড়ার আগে এভাবে ধ্বংস করা হয়েছে।

গেরিলা-যুদ্ধ চালাতে গিয়ে সোভিয়েট জনসাধারণকে নাৎসীদের হাতে নির্যাতিতও কম হতে হয় নি। অনেকক্ষেত্রে নাৎসীরা তাদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার করে। সামোখিন নামে একজন গেরিলা যোদ্ধা ধরা পড়লে নাৎসীরা তাকে এই বলে ভয় দেখায় যে, সে যদি দলের সকলের কথা বলে না দেয় তাকে ট্যাঙ্কের চাকার নীচে ফেলে পিষে মারা হবে। কোন খবর দিতেই সে অস্বীকার করে। নাৎসীরা তখন তাকে ও অন্যান্য বন্দীকে একটা ট্যাঙ্কের সঙ্গে বেঁধে কাঁটাবনের মধ্য দিয়ে অতি দ্রুতগতিতে ট্যাঙ্ক চালিয়ে দেয়। নাৎসী-অধিকৃত এলাকা থেকে এক যৌথ খামারের দুজন স্ত্রীলোক অতি কষ্টে সোভিয়েট ব্যূহে চলে আসে এবং নাৎসীরা কিভাবে তাদের গ্রামে প্রবেশ করে তার বর্ণনা দিতে গিয়ে তারা বলে—নাৎসীরা যৌথ খামারের চেয়ারম্যানকে ধরে দুটি ট্যাঙ্কের সঙ্গে একদিকে তার পা এবং একদিকে তার হাত দুটি বাঁধে এবং সমস্ত গ্রামবাসীর চোখের সামনে তারা তার দেহটাকে টুকরা টুকরা করে ছিঁড়ে ফেলে। তারপর তারা সমস্ত গ্রামবাসীকে শাস্তি দেবার ভয় দেখায় এবং বলে যে স্থানীয় সোভিয়েট কর্তাদের সকলকে ধরিয়ে দেওয়া হোক। কৃষকরা এই ঘৃণ্য কাজ করতে অসম্মত হয়। তখন গ্রামের সাতজন বৃদ্ধকে দড়ি দিয়ে বেঁধে গ্রামের একটি ময়দানে নিয়ে তাদের ওপর দিয়ে একটি ভারি ট্যাঙ্ক চালিয়ে দেওয়া হয়। তারপর চলে গ্রামবাসীদের ওপর তাদের অকথ্য অত্যাচার; বিশেষ করে স্ত্রীলোকের ওপর অত্যাচারটাই মাত্রা ছাড়িয়ে যায়।

পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে হৃত এলাকা পুনরুদ্ধারের পর আরো বহু গ্রাম থেকে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ এরূপ নৃশংস অত্যাচারের কাহিনী শুনতে পান; কিন্তু এত নির্যাতন ও নিপীড়ন সহ্য করেও গ্রামবাসীরা তাদের সংকল্পে অটুট থাকে এবং স্বাধীনতার জন্য তারা সকল বিপদ ও ক্ষতিকে তুচ্ছজ্ঞান করে। সোভিয়েট গেরিলাদের কাহিনী দিয়ে একখানি বিরাট গ্রন্থ রচিত হতে পারে। কাজেই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে তাদের যথার্থ পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। সোভিয়েট গেরিলা-বাহিনীর যে এক বীরাঙ্গনা তার অপূর্ব ত্যাগ ও শৌর্যের জন্য অমরত্ব লাভ করেছে, তার কথা দিয়েই এ প্রসঙ্গ শেষ করব।

এই সোভিয়েট বীরাঙ্গনার নাম জয়া কসমোডেমিয়ানস্কায়া, কিন্তু তানায়া নামেই সে সমধিক পরিচিত। মস্কোর ওপর জার্মানরা যখন ভীষণ ভাবে চাপ দেয় জয়া তখন স্বদেশরক্ষার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে গেরিলাদলে যোগদান করে এবং জার্মান বাহিনীর পশ্চাতে থেকে কাজ চালায়। শিক্ষিতা তরুণী, বয়স মাত্র আঠার, রুশ ও বিদেশী সাহিত্য অধ্যয়নে সে রত ছিল। কিন্তু দেশের দুর্দিনে অধ্যয়ন নিয়ে সে স্থির থাকতে পারল না—ছুটে গেল সে জার্মানদের পশ্চাতে তাদের বিব্রত করে তোলবার জন্য। মস্কোর অদূরে পেট্রিশচেভোর পশ্চাদ্দিকে গিয়ে সে গেরিলাদের সঙ্গে যোগ দিল। সেখানে বহু জার্মান সৈন্য আস্তানা গেড়েছিল। জার্মান শিবিরে এবং বারুদ ও তেলের গুদামগুলিতে সে আগুন লাগাতে লাগল। প্রতিপক্ষের চক্ষে ধূলি দিয়ে এমনভাবে সে তাদের অস্থির করে তুলল যে, তারা দস্তুরমত তার ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। দিনের বেলা সে জঙ্গলে আত্মগোপন করে থাকত এবং রাত্রিবেলা আক্রমণ চালাত। এভাবে কিছুদিন চলল। তারপর খাদ্যের অভাবে তার দলের লোকেরা পুনরায় অনধিকৃত সোভিয়েট এলাকায়

ফিরে যেতে বাধ্য হল। কিন্তু জয়া কিছুতেই গেল না। সে জার্মানদের পিছনে থেকেই কাজ চালাতে লাগল। অবশেষে একদিন রাত্রে একটি রসদবোঝাই জার্মান গাড়ীতে আগুন লাগাতে গিয়ে সে ধরা পড়ল। খবর বের করার জন্য জার্মানরা তাকে নানাভাবে নিগৃহীত করল, কিন্তু কিছুতেই তারা কোন কথা তার কাছ থেকে আদায় করতে পারল না; এমন কি সে তার নিজের নামটিও পর্যন্ত প্রকাশ করল না। শীতের রাত্রে নগ্নপদে এবং একরূপ খালি গায়ে তাকে বরফের ওপর দিয়ে হাঁটিয়ে নেওয়া হল। তৃষ্ণার্ত হয়ে জল চাইলে প্রহরীরা এনে তাকে বিদ্রূপ করে কেরোসিন তেল পান করতে দিল। তারপর একটা জলন্ত ল্যাম্প এনে তার মুখের ওপর রাখা হল। অবশেষে গ্রামের একটি ময়দানে নিয়ে জার্মানরা তাকে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলিয়ে দিল। তার ফাঁসী দেখবার জন্য গ্রাম থেকে সকলকে জোর করে ধরে আনা হল।



সোভিয়েট বীরাঙ্গনা জয়া কসমোডেমিয়ানস্কায়া

ফাঁসীমঞ্চে গিয়ে জয়া গ্রামবাসীদের দেখে বলল, "বন্ধুগণ, নিরাশ হয়ো না, সাহসে বুক বাঁধো। সংগ্রাম চালিয়ে যাও, নাৎসীদের ধ্বংস কর, তাদের পুড়িয়ে মার, কখনো তাদের ছেড় না। মৃত্যুকে আমি ভয় করিনে। দেশের জন্য মরা তো সৌভাগ্যের কথা।"

জার্মান অফিসাররা যখন তাদের এই নৃশংসতার ছবি তুলে নিচ্ছিল তখন তাদের উদ্দেশ করে জয়া একবার বলে উঠল, "তোমরা আমাকে ফাঁসী দিতে পার, কিন্তু আমি একা নই। আমার মত লক্ষ লক্ষ লোক রয়েছে। তাদের সকলকে তোমরা ফাঁসী দিতে পারবে না। আমাকে তোমরা হত্যা করবে, কিন্তু এর প্রতিশোধ তারা নেবে। জার্মান সৈন্যগণ, সময় থাকতে তোমরা আত্মসমর্পণ কর। লাল ফৌজের জয় অনিবার্য।"

তারপর তার গলায় ফাঁসীর রজ্জু পরিয়ে দিয়ে একজন জার্মান সৈন্য যখন লাথি মেরে তার পায়ের তলা থেকে বাক্সটা সরিয়ে দেবে তখন জয়া এই ক'টি কথা বলে পৃথিবী থেকে শেষ বিদায় নিল, "বিদায়, বন্ধুগণ, বিদায়। সংগ্রাম চালিয়ে যাও, ভয় নেই। ষ্ট্যালিন আমাদের সঙ্গে আছেন। তিনি তোমাদের মুক্তি দিতে আসবেন।"

জয়ার সেই আবেদন ব্যর্থ হয় নি। প্রতিটি সোভিয়েট নরনারীর অন্তরকে তা স্পর্শ করেছে। তার নামে "স্বর্ণ তারকা" পদক ঘোষণা করে তার স্মৃতির প্রতি সর্বশ্রেষ্ঠ সোভিয়েট সামরিক সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে। সে আজ "সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বীরাঙ্গনা" আখ্যা লাভ করেছে।

কেন? কিসের জন্য সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে আপামর জনসাধারণের এই মৃত্যুপণ? রণাঙ্গনের উন্মাদনায় নয়, কর্তৃপক্ষের ভ্রূকুটিতে নয়—লোকচক্ষুর অগোচরে, নীরবে, নিঃশব্দে এবং স্বেচ্ছায় এই যে তারা

তিলে তিলে আত্মদান করে যাচ্ছে—এর মূলে রয়েছে কোন্ প্রেরণা ? এই প্রশ্নই আজ জগদ্বাসীর কাছে সব চেয়ে বড় প্রশ্ন এবং জগতের নিপীড়িত মানবসমাজের মুক্তির মধ্যেই রয়েছে এই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর।

লেনিনগ্রাড-অবরোধ

আবার মূল রণাঙ্গনের কথায় আসা যাক। আগষ্ট মাসের শেষ দিকে রুশ রণাঙ্গনে বর্ষা আরম্ভ হয় এবং নীপার নদীর বক্ষ স্ফীত হয়ে ওঠে। উত্তরে ফন লীবের বাহিনী দ্রুত এগিয়ে গিয়ে লেনিনগ্রাডের কাছাকাছি হাজির হয়। আগষ্ট মাস শেষ না হতেই তারা ফিনল্যাণ্ড উপসাগরের দক্ষিণ তীরে কিংইশেপের নিকট গিয়ে পৌঁছে এবং দক্ষিণ দিক দিয়ে একটু ঘুরে গিয়ে নভগোরড দখল করে। পরে এই নভগোরড হতেই তারা ভলখফ নদীর তীর ধরে উত্তর-পূর্ব দিকে অগ্রসর হয় এবং লেনিনগ্রাড-মস্কো রেলপথ বিচ্ছিন্ন করে। তারপর আরো এগিয়ে গিয়ে তারা লেনিনগ্রাড-ভলোগডা রেলপথ অতিক্রম করে। ওদিকে লাডোগা হ্রদের পশ্চিম ও পূর্ব তীর ধরে ফিন বাহিনীও এসে চাপ দেয়। ফলে স্থলপথে লেনিনগ্রাড একরূপ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে; একমাত্র লাডোগা হ্রদ দিয়ে জলপথে মূল সোভিয়েট ভূমির সঙ্গে কিছু যোগাযোগ থাকে। জার্মানরা যখন লেনিনগ্রাডের দিকে এগিয়ে যেতে আরম্ভ করে, বর্ষার জলে তখন সেখানকার পথঘাট ক্রমশ দুর্গম হয়ে ওঠে। জার্মানদের তরফ থেকে এক বেসরকারী খবরে দাবী করা হয় যে, তারা লেনিনগ্রাডের পনর মাইলের মধ্যে গিয়ে পৌঁছেচে। কিন্তু কার্যত জার্মান বাহিনী তখন লেনিনগ্রাডের বূহির্ব্যূহে গিয়েই ঠেকে; আর তারা এগুতে পারে না। সহরের প্রায়

পঞ্চাশ মাইল বাইরে সোভিয়েট বহির্ব্যূহ রচিত হয়। সেই পর্যন্ত গিয়েই জার্মানরা দাঁড়িয়ে যায়।

লেনিনগ্রাডরক্ষার জন্য সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ আগে থেকেই নানারূপ ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। লেনিনগ্রাড সোভিয়েটবাসীদের তীর্থস্থান বললেও অত্যুক্তি হয় না। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে বলশেভিক বিপ্লবের সূত্রপাত হয়েছিল সেখানে। প্রথম দিকে লেনিনগ্রাডের নাম ছিল পেট্রোগ্রাড এবং পরে নাম হয়েছিল সেণ্ট পিটার্সবুর্গ। বিপ্লবোত্তরকালে মহামতি লেনিনের নামানুসারে এই নগরের নাম হয় লেনিনগ্রাড। এই নগরকে কেন্দ্র করে চতুষ্পার্শে সব বড় বড় কল-কারখানা গড়ে ওঠে। কারখানার যন্ত্রপাতি, জাহাজ, কাগজ, এল্যুমিনিয়ম, সেল্যুলোজ প্রভৃতি শিল্পের দিক দিয়ে লেনিনগ্রাড সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে শীর্ষস্থানীয় বললেও চলে। কাজেই এই নগর-রক্ষার আয়োজন সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ ভালভাবেই করেন। নগরের চারদিকে ত্রিশ বর্গমাইল ব্যাপে কংক্রীটের নানারূপ প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হয়। উত্তরে ও পশ্চিমে লাডোগা হ্রদ এবং ফিনল্যাণ্ড উপসাগর, দক্ষিণে ভলডাই পাহাড় ও দক্ষিণ-পশ্চিমে নার্ভা এবং পিপাস হ্রদ পর্যন্ত দুর্গমালা, ট্যাঙ্ক ফেলবার ফাঁদ ও স্থলমাইনে আকীর্ণ করে রাখা হয়। ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধের আশঙ্কায় লাল ফৌজের কর্তৃপক্ষ ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দ হতেই লেনিনগ্রাডরক্ষার ব্যবস্থা সম্প্রসারিত ও দৃঢ়তর করে আসেন। রুশ-ফিন যুদ্ধের পর ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে তাঁরা সেই ব্যবস্থাকে আরো পাকাপোক্ত করে তোলেন। এছাড়া আগেই বলেছি, মার্শাল ভরোশিলফ প্রায় দশ লক্ষ সুশিক্ষিত সৈন্য নিয়ে নগররক্ষার জন্য প্রস্তুত হন। কেবল তাই নয়, প্রয়োজন হলে লেনিনগ্রাডের ত্রিশ লক্ষ অধিবাসীই যাতে রাস্তায় রাস্তায় প্রতিপক্ষের

সঙ্গে লড়তে পারে, তিনি তেমনভাবেও তাদের শিক্ষিত করে তোলেন।

এই বিরাট আয়োজনের ফলে জার্মান ও ফিন বাহিনী চারদিক থেকে আক্রমণ চালিয়েও শেষ পর্যন্ত তেমন সুবিধা করতে পারে নি। বারংবার নগরের কাছে গিয়েও সোভিয়েট বাহিনীর পাল্টা আক্রমণে আবার তাদের ফিরে আসতে হয়। ভলডাই পাহাড় এলাকা থেকে লাল ফৌজ পাল্টা আক্রমণ চালিয়েও লেনিনগ্রাডরক্ষীদের ওপর হতে খানিকটা চাপ কমায়।

এদিকে সেপ্টেম্বর মাসে মার্শাল টিমোশেঙ্কোর বাহিনী স্মোলেনস্ক ও ভিয়াজমার মধ্যবর্তী এলাকায় পাল্টা আক্রমণ করে এবং তাতে মস্কোর দিকে জার্মান বাহিনীর অগ্রগতি কিছুদিনের মত বন্ধ থাকে। কিন্তু অক্টোবর মাসে জার্মানরা মধ্য রণাঙ্গনে পুনরায় উদ্দাম গতিতে আক্রমণ চালায় এবং মস্কোর উত্তর-পশ্চিম, পশ্চিম এবং দক্ষিণ দিক দিয়ে ত্রিধারা অভিযান করে। উত্তর দিকে লেনিনগ্রাড রেলওয়ের ওপর অবস্থিত কালিনিন সহর তারা দখল করে। রেজেভ থেকে জার্মানরা ভলোকোলামস্ক অভিমুখে অগ্রসর হয়। স্মোলেনস্ক-রেলপথ ধরে তারা ভিয়াজমা এবং বরোডিনোর মধ্য দিয়ে মোজাইস্ক পর্যন্ত এগিয়ে যায়। মোজাইস্ক হতে মস্কোর দূরত্ব প্রায় ৬০ মাইল। আরো দক্ষিণে গিয়ে ব্রিয়ানস্ক হতে তারা কালুগা এবং তারপর কালুগা হতে মালো-য়ারোস্লাভেৎস পর্যন্ত অগ্রসর হয়। আরো দক্ষিণে ওরেল থেকে জার্মানরা টুলার দিকে ধাওয়া করে। মোজাইস্কের উত্তরে ও দক্ষিণে দুই 'বাল্‌জ্‌' সৃষ্টি করে জার্মানরা সোভিয়েট সৈন্যদের পরিবেষ্টনের প্রয়াস পায় এবং সেইজন্যই উক্ত দুই এলাকায় যুদ্ধ অতিশয় প্রচণ্ড হয়ে ওঠে। কিন্তু সোভিয়েট বাহিনীর প্রবল প্রতিরোধে জার্মান্দের সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়।

ইতিমধ্যে বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি নিয়ে এক ত্রিশক্তি সম্মেলনের উদ্দেশ্যে লর্ড বীভারব্রুক এবং মিঃ আভেরেল হ্যারিম্যানের নেতৃত্বে একদল বৃটিশ ও মার্কিন প্রতিনিধি ২৮শে সেপ্টেম্বর মস্কোতে গিয়ে পৌঁছেন। সেখানে মঃ ষ্ট্যালিন এবং অন্যান্য সোভিয়েট নেতাদের সঙ্গে তিনদিনব্যাপী আলোচনার পর সম্মেলনের তরফ থেকে ঘোষণা করা হয় যে, সোভিয়েট সামরিক ও বেসামরিক কর্তৃপক্ষগণ যেমন প্রয়োজন বোধ করবেন তেমনভাবে তাঁদের রসদ ও সমরোপকরণাদি সরবরাহ করা হবে বলে এক চুক্তি হয়েছে। আরো বলা হয় যে, কোন্ পথে কিভাবে বেশী মাল প্রেরণ করা সম্ভব সেসব বিষয়েও বিবেচনা করে সমস্ত ঠিক করা হয়েছে। এই চুক্তির পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে 'ঋণ ও ইজারা দান' আইন অনুসারে মাল প্রেরণের ব্যবস্থা হয়।

ওদিকে দক্ষিণ য়ুক্রেনে ওডেসারক্ষীরা শত্রু কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়েও দীর্ঘকাল আত্মরক্ষা করে। মঃ লজোভস্কি সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি এক বিবৃতিতে বলেন, "ওডেসা তব্রুকও নয়, ডানকার্কও নয়, ওডেসা ওডেসা।"

তাঁর সেই উক্তিতে বাড়াবাড়ি কিছুই ছিল না; কেননা ওডেসা পরিবেষ্টিত হওয়ার অনেকদিন পর সোভিয়েট সরকারী মুখপত্র 'ইজভেস্তিয়ার' সহিত সংশ্লিষ্ট মেজর ভিলেনস্কি ওডেসা হতে মস্কোতে গিয়ে যে বিবরণ দেন তাতে তিনি বলেন যে, তখনো পর্যন্ত ওডেসার স্বাভাবিক নাগরিক জীবনযাত্রার তেমন কোন ব্যত্যয় হয় নি। ট্রাম, বাস, দোকানপাট এবং ডাকের চিঠি বিলি তখনো রীতিমতই চলেছে, একমাত্র টেলিগ্রাম পেতে সময়ের কিছু এদিক সেদিক হয়। অবরুদ্ধ হলেও ওডেসায় খাদ্যসঙ্কট দেখা দেয় নি; গম, চিনি ও তরিতরকারী প্রচুর পরিমাণে গুদামজাত

করে রাখা হয়েছে। স্থানীয় সিগারেটের কারখানাগুলিও দাস্তরমত্ত চলেছে। এক মাংসের কিছু অভাব হয়, তার কারণ আশপাশের যেসব লোক মাংস সরবরাহ করত তারা বিপক্ষের আগমনবার্তা পেয়েই



শত্রুর ট্যাঙ্ক ঘায়েল করবার জন্য একজন সোভিয়েট পদাতিক বসে গ্রেনেড অর্থাৎ হাতবোমা ঠিক করে নিচ্ছে।

সময় থাকতে তাদের গরুবাছুর ও অন্যান্য গৃহপালিত পশু অন্যত্র সরিয়ে ফেলে। সহরের প্রান্ত হতে প্রায় ১০ মাইল দূরে বৃত্তাকারে রণাঙ্গন

বিস্তৃত। সেই রণাঙ্গন ও সহরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে রয়েছে প্রচুর শস্য-সম্পদ। তা থেকেই সহরে ফলমূল, তরিতরকারী প্রভৃতি সরবরাহ হয়। তখনো পর্যন্ত ওডেসায় কৃষ্ণসাগরের পথে জাহাজে করে খাদ্য আনাতে হয় নি। যা কিছু আসে অস্ত্রশস্ত্র ও নানাবিধ সমরোপকরণ। তাছাড়া ওডেসায় সেই অবস্থায়ও অস্ত্রনির্মাণের কতকগুলি নতুন কারখানা স্থাপিত হয়।

এ থেকে বুঝতে কোন কষ্ট হয় না যে, সোভিয়েট সৈন্যরা ওডেসা রক্ষার জন্য কিরূপ আয়োজন করে এবং তারা সেখানে কতখানি দৃঢ়তা দেখায়। ওডেসার কাছে এসে প্রতিপক্ষ ভেবেছিল দু'তিন দিনের মধ্যেই তারা বন্দর দখল করে নেবে এবং বিজিত অঞ্চলের খাদ্যাদিতেই তাদের চলবে; কিন্তু তাদের সেই দুই আশাই ব্যর্থ হয়। ক্ষিপ্র-গতিসম্পন্ন যান্ত্রিক যুদ্ধের যুগেও একরূপ অবরুদ্ধ অবস্থায় দীর্ঘকাল ওডেসার আত্মরক্ষা সত্যই বিস্ময়কর !

কিয়েফের পতন

এদিকে কিয়েফ রণাঙ্গনে যুদ্ধের মোড় জার্মানদের অনুকূলে ঘুরে যায়। ১৭ই সেপ্টেম্বর তারা কিয়েফ সহর দখল করে। তার আগে আগষ্ট মাসের প্রথম ভাগেই জার্মানরা একবার কিয়েফের উপকণ্ঠে গিয়ে হাজির হয়েছিল সে কথা পূর্বে বলেছি। তখন লাল ফৌজের তাড়া খেয়ে তাদের পশ্চাতে হটে আসতে হয়। তারপর কিছুদিন কিয়েফের দিকে জার্মান-অভিযানে শিথিলতা আসে। উত্তরে লেনিনগ্রাড এবং দক্ষিণে ওডেসা নিয়েই তারা বিষম ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু সেপ্টেম্বর মাস আসতেই জার্মানরা আবার কিয়েফ রণাঙ্গনে জোর দেয়। তারা নীপার নদী পার হয়ে নিপ্রোপেট্রোভস্কের

উত্তরে ক্রেমেনচুগ দখল করে নেয়। তখনই বোঝা যায়, জার্মান বাহিনীর দক্ষিণ বাহু সেপথে গিয়ে কিয়েফ পরিবেষ্টন করতে চায়। অপর বাহু যায় কিয়েফ হতে ৮০ মাইল উত্তর-পূর্বে চার্নিকোফের পথে। এই দুই সহর যুগপৎ জার্মানদের দখলে যাওয়ায় কিয়েফের বিপদ ঘনিয়ে আসে।

কিয়েফ দখলের জন্য জার্মান বাহিনী সহরের প্রান্তে পৌঁছেই প্রথমে বহির্ব্যূহ ভেদ করে এবং তারপরই কয়েকদিনের জন্য তারা থেমে যায় এবং কেবল লাল ফৌজের পাল্টা আক্রমণ হতে আত্মরক্ষা করতে থাকে। ইতিমধ্যে জেনারেল ফন বক ও জেনারেল ফন রুণ্ডষ্টেডটের বাহিনী পার্শ্বদেশ দিয়ে ঘুরে গিয়ে সহরের প্রায় ষাট মাইল পূবে মিলিত হয়। এদিকে সহরের বহির্দেশে যেসকল জার্মান সৈন্য কেবল আত্মরক্ষায় ব্যাপৃত থেকে সময় অতিবাহিত করছিল তারা সুযোগ বুঝে এবার সহরে প্রবেশের চেষ্টা করল। সেই সময় সহরের উত্তর দিক দিয়ে নীপারের পূর্ব তীর হতে কয়েক ডিভিসন জার্মান সৈন্য পার হয়ে আসল এবং দক্ষিণ দিক হতে নীপারের পশ্চিম তীর ধরে আরো কয়েক ডিভিসন জার্মান সৈন্য এগিয়ে এসে রুশদের সুরক্ষিত এলাকায় প্রবেশ করল। এই এলাকাকে আশ্চর্যভাবে নানা কৌশলে সুরক্ষিত করা হয়েছিল। তা ভেদ করতে জার্মান বাহিনীকে কম বেগ পেতে হয় নি। তবে শেষ পর্যন্ত তাদের আক্রমণে কিয়েফের আত্মরক্ষা-ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ল এলং লাল ফৌজ কিয়েফত্যাগে বাধ্য হল।

রুশ-জার্মান যুদ্ধ বাধার পর জার্মানরা যে তিনটি প্রধান লক্ষ্যস্থলের দিকে অভিযান চালায় তন্মধ্যে কিয়েফ একটি। আর দু'টি হল মস্কো ও লেনিনগ্রাড। কাজেই সামরিক গুরুত্বের দিক দিয়ে কিয়েফ দখলদ্বারা জার্মানদের লাভ-লোকসান যাই হোক, দক্ষিণ রণাঙ্গনে এই

সাফল্য জার্মানদের মধ্যে নতুন উদ্যম ও উৎসাহের সঞ্চার করে এবং এই বিজয়স্তম্ভকে সামনে রেখে নাৎসী নায়কগণ সমর-পরিচালনায় অধিকতর সুবিধা পান।

কিয়েফ দখলের পর জার্মানরা দাবী করে যে, তাদের পরিবেষ্টনের ফলে সেই এলাকায় ৩ লক্ষ ৮০ হাজার সোভিয়েট সৈন্য বন্দী হয়। কিন্তু কিয়েফ দখলের জন্য জার্মানী অনুমান আড়াই লক্ষ সৈন্য নিযুক্ত করে। আড়াই লক্ষ সৈন্যের পক্ষে প্রায় ৪ লক্ষ সৈন্য বন্দী করা কোনভাবেই সম্ভব নয়। বিশেষত লাল ফৌজের মত যোদ্ধারা অত সহজে আত্মসমর্পণ করে না।

কিয়েফের পূর্বদিকে জার্মানরা লাল ফৌজকে পরিবেষ্টনের চেষ্টা করেছিল একথা সত্য; কিন্তু মার্শাল বুদেনী তার আগেই সেখান থেকে তাঁর সৈন্য সরিয়ে নিয়ে যান এবং কিছু পূবে গিয়ে নতুন ব্যূহ রচনা করেন।

কিয়েফে সাফল্যলাভের সঙ্গে সঙ্গেই নীপারের ভাটির দিকে জার্মানরা নদী পেরিয়ে ক্রিমিয়ার দিকে অভিযান চালায়। কয়েক দিনের মধ্যেই তারা পেরেকোপ যোজকে উপনীত হয়। তাতে ক্রিমিয়া স্থলপথে মূল সোভিয়েট ভূমি হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে জার্মানরা প্রথমে ৭৫ হাজার সৈন্য নিয়োজিত করে। কয়েক দিন বাদেই তারা আরো সেখানে শক্তি বাড়ায়। পেরেকোপ যোজকে উভয় পক্ষে ঘোর যুদ্ধ বাধে এবং লাল ফৌজ প্রতিপক্ষকে সেখানে বেশ কিছুদিন ঠেকিয়ে রাখে। পেরেকোপ যোজকে বাধা পেয়ে জার্মানরা চেষ্টা করে ক্রিমিয়ায় প্যারাশুট নামাতে। সোভিয়েট পক্ষ তাদের সেই চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। ক্রিমিয়ায় প্যারাশুট নামান যে সহজ নয় জার্মানরা সামান্য চেষ্টা করেই তা বুঝতে পারে।

ক্রিমিয়ার পশ্চিম প্রান্তেই ছিল প্রসিদ্ধ সোভিয়েট নৌদুর্গ সিবাস্তোপোল। তাছাড়া কৃষ্ণসাগর হতে সোভিয়েট নৌবিভাগীয় বিমান ক্রিমিয়ার যুদ্ধে লাল ফৌজকে বিশেষভাবেই সাহায্য করে।

ওদিকে কিয়েফ দখলের পর জার্মানরা সেখান হতে প্রায় দু'শ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে এবং ক্রেমেনচুগ হতে অনুমান ৬৫ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত পোলটাভা সহরও দখল করে। পোলটাভা হতে একটি রেলপথ কিয়েফে এবং আর একটি রেলপথ পূবে খারকফে গিয়েছে। কাজেই জার্মানরা পোলটাভায় গিয়ে খারকফে পৌছবার মতলব আঁটে। পোলটাভা হতে খারকফ উত্তর-পূর্ব দিকে প্রায় ৮৫ মাইল দূরে অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ শিল্পপ্রধান নগর। সেখানে সোভিয়েট পক্ষের বিস্তর ট্যাঙ্ক নির্মিত হত। তাছাড়া সেখানে অন্যান্য কারখানার সংখ্যাও যথেষ্ট। কাজেই কিয়েফের পতনের পর জার্মানরা খারকফ দখলের জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টিত হয়।

সেই সময় খবর পাওয়া যায়, সাইবেরিয়ায় মার্শাল ব্লুচার শীতকালে যুদ্ধ চালাবার জন্য পাঁচ লক্ষ সোভিয়েট সৈন্যকে বিশেষ ভাবে শিক্ষিত করে তুলছেন ; ডিসেম্বর মাসেই সেই সৈন্যদল যুদ্ধে নামতে পারবে।

সোভিয়েট সামরিকক্ষেত্রে মার্শাল ব্লুচারের একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ভল্গার নিকটে ইয়ারোস্লাভ জেলায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নামের উচ্চারণ অনেকটা জার্মান ধরণের ; কিন্তু তিনি খাঁটি রুশ। তাঁর জন্মস্থানের অনেকেরই নাম জার্মানদের নামের অনুরূপ।

মার্শাল ব্লুচারের কর্মজীবন আরম্ভ হয় একজন শ্রমিকরূপে এবং পরে তিনি একজন মেকানিক হন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে—বয়স তখন তাঁর খুবই কম—সেই সময়ই তিনি বিপ্লবী দলে যোগ দেন। তারপর গত

মহাযুদ্ধে সৈন্যদলে ডাক পড়ায় বাধ্য হয়ে তিনি জারের পক্ষে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে তিনি আহত হন এবং বীরত্বের জন্য পুরস্কার পান। অতঃপর ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি লেনিনগ্রাডে সোভিয়েট সৈন্যদল গঠনে সহায়তা করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সামরিক ব্যাপারে বিচক্ষণতার পরিচয় দেন এবং রুশিয়ার গৃহযুদ্ধে কয়েক স্থলে বলশেভিক সৈন্য পরিচালনা করেন। সাইবেরিয়ার দিকে তিনি তখন যুদ্ধ চালান এবং কার্যত সোভিয়েটের সুদূর প্রাচ্য তিনিই রক্ষা করেন। কোলচাক, সেমেনফ প্রভৃতি বিপ্লববিরোধী নায়কগণ তাঁরই সৈন্যদল কর্তৃক পরাভূত হন এবং জাপানীরা মার খেয়ে ভ্লাডিভোষ্টকে ফিরে যেতে বাধ্য হয়।

তারপর কিছুকালের জন্য তিনি মস্কোতে ফিরে আসেন এবং লাল ফৌজের পুনর্গঠনে মঃ লিয়ঁ ট্রটস্কিকে সাহায্য করেন। কিন্তু আকর্ষণটা তাঁর থাকে সুদূর প্রাচ্যের দিকেই। কাজেই সুযোগ আসামাত্রই তিনি মোঙ্গোলিয়ায় চলে যান। তার কিছুকাল পর ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথে একদিন ভ্রমণকালে হঠাৎ রেলের কামরায় চিয়াং-কাইশেকের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। চিয়াং তখন চীনের একজন তরুণ সামরিক অফিসার। আলাপের ফলে উভয়ের মধ্যে বিশেষ সৌহার্দ্য জন্মে। চিয়াং ব্লুচারকে ক্যাণ্টনে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ করলেন। ব্লুচার সেই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। তিনি লাল ফৌজ হতে বিদায় নিয়ে ক্যাণ্টনে গেলেন এবং সেখানে গিয়ে চিয়াংএর সামরিক বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষকের পদ গ্রহণ করলেন। চীনারা তাঁকে 'গা-লিন' বলে ডাকত। ফলে তাঁর পরিচয় নিয়ে এক রহস্যের সৃষ্টি হল। চীনে বিদেশীরা তাঁকে জেনারেল 'গ্যালেন' বা 'গ্যালাণ্ট' বলে অভিহিত করত এবং কয়েক বছর তিনি ব্লুচারের পরিবর্তে এই নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। চিয়াং-কাইশেক

প্রথম দিকে যেসকল অভিযানে জয়লাভ করেন তার গৌরব ব্লুচারেরই অধিকাংশ প্রাপ্য। তারপর কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে চিয়াংএর যখন বিরোধ উপস্থিত হল, ব্লুচার তখন চীন হতে পালিয়ে মস্কোতে ফিরে গেলেন। সেখান হতে আবার তাঁকে সাইবেরিয়ায় পাঠান হল। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে তিনি সোভিয়েট সুদূর প্রাচ্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতিত্ব লাভ করেন। বলতে গেলে সাইবেরিয়ার সোভিয়েট বাহিনী একরূপ তাঁরই সৃষ্টি।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে মার্শাল ব্লুচারের পদচ্যুতি, গ্রেপ্তার, হত্যা, আত্মহত্যা প্রভৃতি নানারূপ আজগুবি খবর রটে; কিন্তু তিনি আগাগোড়া মঃ ষ্ট্যালিনের বিশেষ অন্তরঙ্গই থাকেন এবং সোভিয়েট সুদূর প্রাচ্য নানাভাবে সুরক্ষিত করে জাপানের সাইবেরিয়া অভিযানের আকাঙ্ক্ষা অনেকখানি দমিয়ে দেন।

সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে রুশ-রণাঙ্গনে যুদ্ধের অবস্থা মোটামুটি এরূপ দাঁড়ায়ঃ

উত্তরে জার্মানরা সরাসরি আক্রমণ চালিয়ে লেনিনগ্রাড দখলের চেষ্টা করে। মধ্য রণাঙ্গনে স্মোলেনস্ক এলাকায় মার্শাল টিমোশেঙ্কোর বাহিনী বার বার প্রতিপক্ষের ওপর পাল্টা আক্রমণ চালায়। দক্ষিণে ১৯শে সেপ্টেম্বর কিয়েফের পতন হয়। কিয়েফের পূর্বদিকে পশ্চাদ-পসরণের সময় মার্শাল বুদেনীর বাহিনীকে পরিবেষ্টনের জন্য জার্মানরা যে চেষ্টা করে তা ফেঁসে যায়। সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে উত্তরে নভগোরড হতে স্মোলেনস্কের পূব দিয়ে নীচের দিকে এসে নিপ্রোপেট্রোভস্ক হয়ে দক্ষিণে ক্রিমিয়া পর্যন্ত জার্মানরা প্রায় এক সোজা লাইন করে দাঁড়ায়। বার্লিনে তখন হিটলার ঘোষণা করেন যে, রুশ রণাঙ্গনে জার্মান অভিযান আগাগোড়া "পরিকল্পনা অনুযায়ীই" চলেছে এবং ইতিমধ্যে লাল ফৌজের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গিয়েছে।

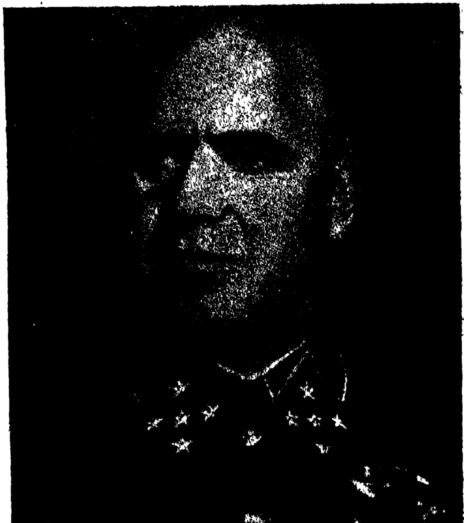
তারপর অক্টোবর মাস পড়তেই জার্মানরা মস্কোর দিকে নবোদ্যমে অভিযান চালায়। তার দক্ষিণে য়ুক্রেনের দিকে তারা নীপার নদী পেরিয়ে খারকফ দখল করে এবং ডোনেট্জ্ অববাহিকার বড় বড় শিল্পকেন্দ্র ও খনিপ্রধান সহরগুলি হস্তগত করার পর ডোনেট্জ নদীর দিকে অগ্রসর হয়। কৃষ্ণসাগর ও আজফ সাগরের সমগ্র উত্তর উপকূল ভাগ দখল করে তারা টাগানরগ পর্যন্ত এগিয়ে যায় এবং সেখান হতে ডন নদীর মোহনায় অবস্থিত প্রসিদ্ধ বন্দর রোষ্টফের অদূরে গিয়ে পৌছে। বহু চেষ্টা করেও সোভিয়েট বাহিনী ওডেসারক্ষায় অসমর্থ হয় এবং ক্রিমিয়া মূল সোভিয়েট ভূমি হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। জার্মানরা পেরকোপ যোজকে ভীষণ ভাবে লড়াই আরম্ভ করে।

মধ্য রণাঙ্গনে ২০শে অক্টোবর মস্কো নগরী একরূপ অবরুদ্ধ বলে ঘোষিত হয় এবং সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ মস্কো হতে প্রায় পাঁচশ' মাইল দূরে ভল্গাতীরে অবস্থিত কুইবিশেফ সহরে কোন কোন সরকারী দপ্তরখানা স্থানান্তরিত করেন। বিদেশী দূতরাও মস্কো হতে সেখানে চলে যান। ২৪শে অক্টোবর সমগ্র রুশ রণাঙ্গনকে দু'ভাগে ভাগ করে দু'জন প্রধান সেনাপতির ওপর দু'রণাঙ্গনের ভার দেওয়া হয়। মস্কো হতে লেনিনগ্রাড পর্যন্ত উত্তর রণাঙ্গনের ভার পান জেনারেল জুকফ এবং সমগ্র দক্ষিণ রণাঙ্গনে সৈনাপত্য লাভ করেন মার্শাল টিমোশেঙ্কো। মার্শাল ভরোশিলফ এবং মার্শাল বুদেনী রণাঙ্গনের পশ্চাতে গিয়ে নতুন সৈন্যদল গঠন ও তাদের শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করেন।

জেনারেল জুকফ একজন চাষীর ছেলে। সেই অবস্থা থেকে তিনি ক্রমে লাল ফৌজের সেনানীমণ্ডলীর অধ্যক্ষ হন। বয়স তাঁর পঞ্চাশেরও কম। তিনি একজন ভাল অশ্বারোহী। এক সময় তিনি সুদূর প্রাচ্যে সোভিয়েট দ্বিতীয় আর্মি কোরের অধিনায়কত্বও করেছিলেন। তাঁরই

পরিচালনায় সোভিয়েট সৈন্যরা চ্যাংকুফেং পর্যন্ত যায় এবং ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে মোঙ্গোলীয় সীমান্তে জাপানীদের পরাভূত করে। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি মার্শাল পদে উন্নীত হন।

জেনারেল জুকফের ওপর মস্কোরক্ষার ভার অর্পিত হবার পর মার্শাল শাপোশনিকফ পুনরায় সোভিয়েট সেনানীমণ্ডলীর অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হন। কিছুকাল আগে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ায় তিনি অবসর গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর স্থলে জেনারেল জুকফ অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, রুশ ষ্ট্র্যাটেজী সম্বন্ধে মার্শাল শাপোশনিকফের জ্ঞান অসাধারণ এবং মঃ ষ্ট্যালিন তাঁর মতামতের বিশেষ মূল্য দিয়ে থাকেন।



মার্শাল জুকফ

য়ুক্রেনে ডোনেট্‌জ্‌ অববাহিকা ও আজফ সাগরের উত্তর তীর ধরে রোষ্টফের দিকে জার্মানরা এগিয়ে যাওয়ায় সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের তৈল-ভাণ্ডার ককেশাসের সমূহ বিপদ দেখা দেয়। ক্রিমিয়ায় জার্মান সাফল্য আরো ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সেপ্টেম্বরের শেষ ভাগে জার্মানরা ক্রিমিয়া আক্রমণ করে। সোভিয়েট বাহিনী প্রায় এক মাস সঙ্কীর্ণ

যোজক পেরকোপে তাদের ঠেকিয়ে রাখে। ২৯শে অক্টোবর জার্মানরা সোভিয়েট ব্যূহ ভেদ করে ক্রিমিয়ায় ঢুকে পড়ে এবং তিন দিন পরে ক্রিমিয়ার রাজধানী সিম্ফারোপোল তাদের দখলে যায়। সোভিয়েট বাহিনীর একটা অংশ গিয়ে সিবাস্তোপোলের আত্মরক্ষাব্যূহে আশ্রয় নেয় এবং অপর অংশ পূর্বদিকে পশ্চাদপসরণ করে। ৫ঠা নবেম্বর জার্মানরা থিওডোসিয়ায় প্রবেশ করে এবং তারপর আরো পূবে এগিয়ে গিয়ে তুমুল যুদ্ধের পর ১৭ই নবেম্বর তারা কার্চ বন্দর দখলে সমর্থ হয়। তার ফলে আজফ সাগরের প্রবেশপথে তারা আধিপত্য লাভ করে।

অনেকে তখন অনুমান করেন যে, সঙ্কীর্ণ কার্চ প্রণালী পেরিয়ে জার্মানরা ককেশাসে অভিযান করবে। কিন্তু সে পথে অভিযানের চেষ্টা না করে জার্মানরা স্থলপথে ককেশাসে পৌছার জন্য রোষ্টফের দিকে চাপ দেয়। কার্চ থেকে ককেশাসে অভিযান চালাতে জার্মানরা দু'টি কারণে ইতস্তত বোধ করে। প্রথমত ক্রিমিয়ার পশ্চিমপ্রান্তে প্রসিদ্ধ নৌদুর্গ সিবাস্তোপোল তখনো পর্যন্ত লাল ফৌজের হাতে। দ্বিতীয়ত কৃষ্ণসাগরে সোভিয়েট নৌবলের প্রাধান্য। কাজেই তারা স্থলপথে যাওয়াই অধিকতর নিরাপদ বলে মনে করে। আজফ সাগরের তীর ধরে তারা রোষ্টফ বন্দরে গিয়ে উপনীত হয়; কিন্তু সেখানেই সুরু হয় মার্শাল টিমোশেঙ্কোর পাল্টা আক্রমণ। ডন নদী পার হয়ে মার্শাল টিমোশেঙ্কোর বাহিনী সোজা রোষ্টফ বন্দরে প্রতিপক্ষের উপর আক্রমণ চালায় এবং তার ফলে জার্মানরা রোষ্টফত্যাগে বাধ্য হয়। নবেম্বরের শেষ সপ্তাহে এই পাল্টা আক্রমণ চলে। ডোনেট্‌জ্‌ এলাকা থেকেও সোভিয়েট বাহিনী প্রতিপক্ষের পার্শ্বদেশে ঘা দেয় এবং তার ফলে জার্মানরা রোষ্টফের পঞ্চাশ মাইল পশ্চিমে টাগানরগে

সরে আসতে বাধ্য হয়। এতে ককেশাসের সমূহ বিপদ তখনকার মত কেটে যায়। রোষ্টফ উদ্ধার করে লাল ফৌজ ডোনেট্জ্ শিল্পাঞ্চল শত্রুমুক্ত করার প্রয়াস পায়। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ বাধার পর স্থলযুদ্ধে জার্মানীর এই প্রথম সর্বাপেক্ষা বড় পরাজয়।

ওদিকে ডিসেম্বর মাসে ক্রিমিয়ায়ও আবার যুদ্ধের চাকা ঘুরে যায়। ৩০শে ডিসেম্বর জলপথে সোভিয়েট সৈন্য এসে ক্রিমিয়ায় অবতরণ করে এবং কার্চ বন্দর ও থিওডোসিয়া পুনরায় তাদের হস্তগত হয়। কয়েকদিন পর ক্রিমিয়ার পশ্চিম প্রান্তে ইওপেটোরিয়ায়ও সোভিয়েট সৈন্য অবতরণ করে এবং সিবাস্তোপোলরক্ষীরা তৎপর হয়ে ওঠে।

সোভিয়েট পাল্টা আক্রমণ

এদিকে প্রচণ্ড শীত আসার আগেই মস্কো দখলের জন্য জার্মানরা মধ্য রণাঙ্গনে বিশেষ জোর দেয়। সমস্ত নবেম্বর মাস ভরে তারা সেখানে ক্রমাগত শক্তি বাড়িয়ে চলে। মস্কোর উত্তর-পশ্চিমে শতখানেক মাইল দূরে অবস্থিত কালিনিন সহর হতে আরম্ভ করে মস্কোর দক্ষিণে টুলা পর্যন্ত বিস্তৃত রণাঙ্গনে জার্মানরা সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী দখলের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। অক্টোবর মাসের মস্কো-অভিযানে মাত্র সতেরটি জার্মান ডিভিসন নিয়োজিত হয়েছিল; নবেম্বর মাসে সেখানে নিয়োজিত হয় চল্লিশ ডিভিসন। দিনের পর দিন অবিরাম ট্যাঙ্কযুদ্ধ চলতে থাকে। কালিনিনের দক্ষিণে জার্মানরা এগিয়ে ক্লিন পর্যন্ত যায় এবং সেখান থেকে মস্কো-ভল্গা খালের দিকে তারা অগ্রসর হয়। মোজাইস্ক-মালো য়ারোস্লাভেৎস এলাকায় তারা নারা নদী পার হয়ে নারাফোমিনস্ক অতিক্রম করে এবং মস্কোর উপকণ্ঠ হতে মাত্র ৩৬ মাইলের মধ্যে গিয়ে পৌঁছে। মস্কোর দক্ষিণ দিকে টুলায় বাধা পেয়ে তাদের দাঁড়াতে

হয় সত্য, কিন্তু টুলার পূবদিকে এগিয়ে তারা ষ্ট্যালিনোগস্ক দখল করে এবং সেখান থেকে তারা উত্তরে ওকা নদীর তীরে পৌছবার প্রয়াস পায়। কিন্তু তদ্দূর আর তারা যেতে পারে না ; কিছু দূর গিয়েই তাদের থামতে হয়।

ডিসেম্বর মাসের প্রথম ভাগে মস্কো-রণাঙ্গনে জার্মান আক্রমণের তীব্রতা শিথিল হয়ে আসে। প্রচণ্ড শীতে জার্মানদের অবস্থা অত্যন্ত কাহিল হয়ে দাঁড়ায় ; সুযোগ বুঝে সোভিয়েট বাহিনী তাদের ওপর দুর্বার বেগে পাল্টা আক্রমণ চালায়। আক্রমণোদ্যম জার্মানদের হাত হতে সোভিয়েট হাতে চলে যায় এবং জার্মানরা ক্রমশ পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়। জার্মান সামরিক কর্তৃপক্ষ অবশ্য সাফাই গাইতে আরম্ভ করেন যে, শীতকালে আত্মরক্ষার জন্য রণাঙ্গন সঙ্কোচনের প্রয়োজনেই জার্মান বাহিনী পশ্চাতে হটে এসে নতুন ব্যূহে আশ্রয় নিচ্ছে ; কিন্তু সোভিয়েট বাহিনীর পাল্টা চাপে যে তারা সরে আসতে বাধ্য হয় সেকথা আর জার্মান সামরিক কর্তৃপক্ষ বেশী দিন চাপা দিয়ে রাখতে পারেন না। দেখতে দেখতে মস্কোর উত্তর-পশ্চিমে ক্লিন ও কালিনিন সহর পুনরায় সোভিয়েট বাহিনীর হস্তগত হয়। মস্কোর পশ্চিমে সোভিয়েট বাহিনী আবার ভলোকোলামস্ক এবং রুজাতে বিজয়গর্বে প্রবেশ করে। মালো য়ারোস্লাভেৎস হতে টুলা পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় জার্মানরা দ্রুত পশ্চাদপসরণ করে। কেবল মোজাইস্কে জার্মানরা দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। ডিসেম্বর মাসের শেষদিকে একমাত্র মোজাইস্কের নিকটবর্তী এলাকা ভিন্ন জার্মানরা সর্বত্র মস্কো হতে একশ মাইলের বাইরে চলে যেতে বাধ্য হয়।

কেবল মস্কো রণাঙ্গনেই নয়, লেনিনগ্রাডের পূবেও লাল ফৌজ টিখভিন পুনরুদ্ধার করে। নবেম্বর মাসে টিখভিন জার্মানদের হাতে

গিয়েছিল। টিখভিন থেকে সোভিয়েট বাহিনী চুড়োভো হয়ে নভগোরডের দিকে এগিয়ে যায়। তাদের এই অগ্রগতি ও কালিনিন পুনরধিকারের ফলে লেনিনগ্রাড-মস্কো রেলপথ মুক্ত হয় এবং উভয় নগরের মধ্যে পুনরায় সরাসরি চলাচলের পথ খুলে যায়। লাল ফৌজ টুলার দক্ষিণে ইয়েলেৎস পুনরুদ্ধার ক'রে মস্কো-রোষ্টফ রেলপথ মুক্ত করে এবং কুরস্ক ও খারকফের দিকে এগিয়ে চলে। দক্ষিণে তারা



সোভিয়েট বোমারু বিমান

ডোনেট্‌জ্‌ এলাকা থেকে আক্রমণ চালায় এবং আজফ সাগরের উত্তর তীরস্থিত জার্মান বাহিনীর ওপর ভালভাবেই চাপ দেয়। ক্রিমিয়ায় জলপথে এসে লাল ফৌজ অবতরণে সক্ষম হওয়ায় পূর্ব য়ুক্রেনে জার্মান বাহিনীর পশ্চাদ্দিক হতে আক্রান্ত হবার একটা আশঙ্কা দেখা দেয়।

১৯শে ডিসেম্বর জার্মান প্রধান সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল ফন ব্রাউশিশকে পদচ্যুত করে হিটলার সমগ্র জার্মান বাহিনীর অধিনায়কত্ব সহস্তে গ্রহণ করেন।

সেই সময় বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ইডেন কমন্সসভায় এক বক্তৃতায় বলেন :—

"রুশ রণাঙ্গনে সোভিয়েট বাহিনীর বর্তমান সাফল্য আকস্মিক

বা অপ্রত্যাশিত নয়। গ্রীষ্মকালীন যুদ্ধে সোভিয়েট বাহিনী পশ্চাদপসরণ করেছে সত্য, কিন্তু প্রতিপক্ষের তারা ক্ষতিও করেছে যথেষ্ট। 'পোড়ামাটি' নীতি অনুসরণ করে তারা কোন উপকরণই প্রতিপক্ষের হস্তগত হতে দেয়নি। তারপর রণাঙ্গনের পশ্চাতে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ বিপুল ভাবে নতুন সৈন্যদল গড়ে তুলেছেন। একদিকে জার্মান বাহিনী যখন রণক্লান্ত ও দুরন্ত শীতে বিপর্যস্ত, তখন অপরদিকে সোভিয়েট পক্ষ রণাঙ্গনে নতুন সৈন্যদল আমদানী করে প্রতিপক্ষের ওপর ভীষণ ভাবে চাপ দেয় এবং তাতেই জার্মান বাহিনী এভাবে কাহিল হয়ে পড়ে। মার্শাল ভরোশিলফ ও মার্শাল বুদেনী নতুন সৈন্যদল গঠনে যে সফলকাম হয়েছেন এদ্দ্বারা তা নিঃসন্দেহেই প্রমাণিত হয়। রুশ রণাঙ্গনে জার্মানদের বর্তমান পরাজয়দ্বারা এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না যে, আর তারা মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারবে না বা এখানেই তাদের শেষ পরাজয়; কিন্তু একথা অবিসম্বাদিত সত্য যে, ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে জার্মান বাহিনী যে অবস্থায় ছিল আজ আর তারা সেই অবস্থায় নেই। আগামী বসন্ত কালে নতুন উদ্যমে যুদ্ধ চালালেও জার্মানীর পূর্বশক্তি ফিরে পাওয়া কঠিন।"

কয়েক মাস পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে সোভিয়েট বাহিনী ভৌগোলিক বিচারে দেশ পুনরুদ্ধারের দিক দিয়ে যে খুব বেশী অগ্রসর হতে পারল এমন নয়; কিন্তু তাদের পাল্টা ঘা খেয়ে প্রতিপক্ষের সৈন্য ও সমরোপকরণে যে ক্ষতি হল, সামরিক হিসাবে তার মূল্য যথেষ্ট। হিটলারও একদা বলেছিলেন যে, সোভিয়েট দেশ দখল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য নয়, তাঁর আসল লক্ষ্য সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সমরসামর্থ্য নষ্ট করা। ঠিক একই কথা সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

সেও যদি জার্মানীর সমরসামর্থ্য নষ্ট করতে পারে তবে দেশ পুনরুদ্ধার করতে তারও বেশী কষ্ট হবে না। সমরসামর্থ্য নষ্ট হলে হয়ত জার্মান বাহিনী সোভিয়েট ভূমিতে থাকতেই জার্মানীর পক্ষ থেকে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব আসতে পারে। গত মহাযুদ্ধেও ঠিক এমনি অবস্থা হয়েছিল। জার্মানী যখন যুদ্ধবিরতির চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করল তখনো পর্যন্ত জার্মান বাহিনী ফ্রান্সেরই বুকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রুশ রণাঙ্গনেও তার পুনরাবর্তন হওয়া কিছু অসম্ভব নয়। অবশ্য জার্মানীর সমরসামর্থ্য নষ্ট করা সময় সাপেক্ষ; কেননা সোভিয়েট



সোভিয়েট ফাইটার বিমান

যুক্তরাষ্ট্রকে আক্রমণের আগেই হিটলার য়ুরোপের অধিকাংশ দেশ জয় করে তার সমরসামর্থ্য বাড়াবার ব্যবস্থা করে নেন। কিন্তু 'টাইম টেবল্' অনুসারে অর্থাৎ প্রচণ্ড শীত পড়ার আগেই মস্কো-দখলের জন্য প্রবল ভাবে ঘা দিতে গিয়ে নিজে যে ঘা খান তার জের অনেক দূর পর্যন্ত গড়ায়। অনেকের ধারণা আছে এবং সেই ভাবেই যথেষ্ট প্রচারকার্য করা হয়েছে যে, যুদ্ধে জয়লাভের জন্য হিটলার কোন ক্ষতির প্রতিই ভ্রূক্ষেপ করেন না—অর্থাৎ তিনি যেন সামরিক বল প্রয়োগে বেহিসাবী। হিটলারের সমরনীতি সম্বন্ধে এ একটা ভ্রান্ত

ধারণা। তাঁর উক্তিতে ঠিক এর বিপরীত কথাই পাওয়া যায়। তিনি বলেন :—

"যুদ্ধ আরম্ভ হবার আগে কিভাবে শত্রুর মনোবল বিনষ্ট করা যায় সেকথাই আমি বিশেষ ভাবে চিন্তা করি। রণাঙ্গনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যাঁদের আছে তাঁদের প্রত্যেকেই অনাবশ্যক রক্তক্ষয় এড়াবার চেষ্টা করবেন।"

অতএব দেখা যায়, সামরিক বলের প্রয়োগ সম্বন্ধে হিটলার মোটেই অসাবধান নন। সম্মুখযুদ্ধে বিস্তর ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে বলেই তাঁর বাহিনী সাধারণত পাশ কাটিয়ে গিয়ে প্রতিপক্ষেয় পশ্চাদ্দিকে দুর্বল স্থানে ঘা দিবার চেষ্টা করে। ফ্রান্স, বেলজিয়ম, হল্যাণ্ড প্রভৃতি রণাঙ্গনে এই নীতিতেই তাঁর যুদ্ধ পরিচালিত হয়। যেখানে এর ব্যত্যয় ঘটেছে সেখানেই তাঁকে বিপুল ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে। রুশ রণাঙ্গনেও হিটলারের বাহিনী এই নীতিতেই যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল ; কিন্তু মস্কোর দ্বারে গিয়ে দেখল সোভিয়েট বাহিনীর আত্মরক্ষাব্যূহ সেখানে দুর্ভেদ্য। অথচ 'টাইম টেবল্' অনুসারে কড়া শীত পড়ার আগেই মস্কো দখল না করতে পারলে মুস্কিল। কাজেই জার্মান বাহিনীর ওপর নির্দেশ হল, যে কোনভাবে মস্কো দখল করতেই হবে। জার্মানরা দক্ষিণে ওরেল হতে এক বাহু এবং উত্তরে কালিনিন হতে আর এক বাহু সম্প্রসারিত করে তাদের সমরনীতি অনুযায়ী মস্কোকে পরিবেষ্টনের চেষ্টা করল। কিন্তু সেই চেষ্টা তাদের ব্যর্থ হওয়ায় মস্কো দখলের জন্য অবশেষে তারা বেপরোয়া হয়ে সোজাসুজি সোভিয়েট ব্যূহে আক্রমণ চালাল। জার্মান রণকৌশলের ব্যত্যয় ঘটল এবং তার ফলে মস্কোর দ্বারে গিয়ে তাদের যে বিপুল ক্ষতি হল তাতে যুদ্ধের মোড ঘুরে গেল। মস্কো রণাঙ্গনের প্রভাব সমগ্র সোভিয়েট

রণাঙ্গনের ওপর পড়ল, এবং জার্মানরা যা খেয়ে আক্রমণাত্মক নীতি ছেড়ে যুদ্ধে আত্মরক্ষাত্মক নীতি গ্রহণে বাধ্য হল। দেখতে দেখতে প্রচণ্ড শীত এসে পড়ল এবং সোভিয়েট বাহিনীর তাতে খুবই সুবিধা হয়ে গেল। ক্রমাগত ঘা খেয়ে লাল ফৌজ যেটুকু দুর্বল হয়ে পড়েছিল সময় পেয়ে তারা তা সেরে নিল। হিটলারও এই পরাজয়ের গ্লানি হতে মুক্তির জন্য তাঁর বসন্তকালীন অভিযানের আয়োজনে মন দিলেন।

দ্বিতীয় বর্ষের অভিযান

সোভিয়েট রণাঙ্গনে এই বিষম ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও হিটলার পুনরায় বসন্ত কালে অভিযান চালাবার জন্য নতুন শক্তিসঞ্চয়ে সক্ষম হলেন। সোভিয়েট শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার আগে তিনি একে একে য়ুরোপের দেশগুলি গ্রাস করেন। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, সেই সব দেশ তাঁকে সাহায্য করতে বাধ্য। কতকগুলি দেশ হতে তিনি সরাসরি সেনাসাহায্য পান এবং কতকগুলি দেশ হতে তিনি সম্পদ ও শ্রমিক সংগ্রহ করেন। বিজিত দেশসমূহে সৈন্যদল গঠন এবং তাদের রণক্ষেত্রে প্রেরণে অসুবিধা ও আশঙ্কার কারণ আছে; কিন্তু সাধারণ শ্রমিকের কাজে তাদের নিয়োগ করতে তেমন কোন ভয় বা আশঙ্কার কারণ নেই। আধুনিক 'টোটাল ওয়ার' অর্থাৎ সার্বিক যুদ্ধে শ্রমিকের প্রয়োজন কত বেশী একথা কারো অবিদিত নেই। রণাঙ্গনে একজন সৈন্য প্রেরণ করতে হলে তার পশ্চাতে নিতান্ত কম পক্ষে তিনজন শ্রমিক নিয়োগ করা দরকার। অর্থাৎ প্রতি যোদ্ধায় তিনজন শ্রমিক প্রয়োজন। যুদ্ধে দশ লক্ষ সৈন্য পাঠাতে হলে তাদের অস্ত্র-নির্মাণ ও রসদ সরবরাহের জন্য অন্তত ত্রিশ লক্ষ শ্রমিক দরকার।

সুতরাং বিজিত দেশসমূহে শ্রমিক সংগ্রহ করে হিটলার বেশী সংখ্যায় জার্মানদের যুদ্ধে পাঠাতে সক্ষম হন। এই কারণেই হিটলারের যোদ্ধসংখ্যা বহুলাংশে বেড়ে যায় এবং রুশ রণাঙ্গনে অপরিমেয় ক্ষতি সত্বেও তাঁর শক্তির উৎস নিঃশেষ হয়ে আসে না। বিজিত দেশ ও মিত্র রাষ্ট্র হতে হিটলার শ্রমিক সংগ্রহ করে কিভাবে শক্তি বাড়ান একটা হিসাব দিলেই তার কতকটা বোঝা যাবে। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিজিত ও আশ্রিত দেশগুলি হতে হিটলার যত শ্রমিক লাভ করেন নিম্নে তার হিসাব দেওয়া গেল :—

দেশ	পুরুষ	নারী
পোলাণ্ড	৭,৪৪,৮০০	২,৬২,৭০০
সুদেতেনল্যাণ্ড	১,১১,৮০০	২৮,২০০
স্লোভাকিয়া	৫৪,০০০	২৬,০০০
হাঙ্গারী	২৫,৪০০	৯,৬০০
যুগোস্লাভিয়া	৮২,৮০০	২৬,০০০
বুলগেরিয়া	১৪,৪০০	২০০
ইতালী	২,৫০,০০০	২১,৭০০
ফ্রান্স	৩৪,০০০	১৪,৫০০
বেলজিয়ম	১,০৬,৮০০	১৪,৭০০
হল্যাণ্ড	৮০,৮০০	১২,৩০০
ডেনমার্ক	২৫,৩০০	৩,৬০০
অন্যান্য দেশ	১,৩৭,৩০০	৫২,৬০০
	১৬,৬৭,৪০০	৪,৭২,১০০

এই হিসাব অনুসারে দেখা যায়, ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত হিটলার স্ত্রী ও পুরুষে মোট ২১,৩৯,৫০০ শ্রমিক লাভ করেন।

তদুপরি সমরবন্দীর সংখ্যা প্রায় বিশ লক্ষ। সমরবন্দীদের অধিকাংশকেই কৃষিকার্যে নিয়োজিত করা হয়।

হিটলার এই উপায়েই তাঁর রুশ রণাঙ্গনের ক্ষতি পূরণ করেন। সেখানে ক্ষতি যতই বেড়ে চলে, অধিকৃত দেশগুলির ওপর ততই শ্রমিক যোগাবার জন্য বেশী চাপ পড়ে। এছাড়া জার্মানীর তাঁবেদার ও মিত্র রাষ্ট্রগুলি বেশী সৈন্য যোগাতে বাধ্য হয়। তার ফলেই দ্বিতীয় বর্ষেও রুশ রণাঙ্গনে হিটলার ১৭৯টি জার্মান ডিভিসন, ২২টি রুমানীয় ডিভিসন, ১৪টি ফিন ডিভিসন, ১৩টি হাঙ্গারীয় ডিভিসন, ১০টি ইতালীয় ডিভিসন, ১টি স্লোভাক ডিভিসন এবং ১টি স্পেনীয় ডিভিসন—মোট ২৪০টি ডিভিসন নিয়োজিত করতে সমর্থ হন।

এই বিরাট বাহিনী নিয়ে হিটলার ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে পুনরায় রুশ রণাঙ্গনে অভিযান চালান। কিন্তু দ্বিতীয় বর্ষের এই অভিযান প্রধানত দক্ষিণ রনাঙ্গণেই সীমাবদ্ধ থাকে, অন্যান্য রণাঙ্গনে জার্মানরা কেবল আত্মরক্ষা করে চলে। মিঃ ইডেন কমন্সসভায় তাঁর বক্তৃতায় যে অনুমান প্রকাশ করেছিলেন তাই সত্যে পরিণত হয়। প্রথম বর্ষের মত দ্বিতীয় বর্ষে জার্মান আক্রমণ আর তত ব্যাপক হয় নি। কেবল দক্ষিণ রণাঙ্গনেই তা সীমাবদ্ধ হয়। মার্শাল টিমোশেঙ্কো প্রথমে খারকফ এলাকায় জার্মানদের ঠেকাতে চেষ্টা করেন এবং সেখানে কয়েকদিন উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ চলে। কিন্তু জার্মান চাপ সহ্য করতে না পেরে অবশেষে তিনি পশ্চাদপসরণে বাধ্য হন এবং জার্মানরা ক্রমশ পূবদিকে এগিয়ে যেতে থাকে। এদিকে ক্রিমিয়ায় নৌদুর্গ সিবাস্তো-পোলের পতন হয়। রোষ্টফ বন্দরও জার্মানদের হাতে আসে এবং সেপথে তারা ককেশাসে গিয়ে প্রবেশ করে। তার উজানে জার্মানরা ডন নদী পেরিয়ে ষ্ট্যালিনগ্রাড পর্যন্ত যায়, কিন্তু সেখানে তিন মাসের

চেষ্টায়ও তারা ষ্ট্যালিনগ্রাড দখলে অসমর্থ হয়। জার্মান সৈন্য সহরে প্রবেশ করে, কিন্তু সেখানে রাস্তায়-রাস্তায়, বাড়ীতে বাড়ীতে উভয় পক্ষে যুদ্ধ চলে। কোন সহরের বুকে এমন যুদ্ধ কখনো হয়েছে বলে এপর্যন্ত শোনা যায় নি। সোভিয়েট বাহিনী শেষ পর্যন্ত নগররক্ষায় সমর্থ হয় এবং সুযোগ বুঝে পুনরায় পাল্টা আক্রমণ আরম্ভ করে। মধ্য রণাঙ্গনে রেজেভের দিকেও সোভিয়েট বাহিনী আক্রমণ চালায় এবং প্রসিদ্ধ রেলওয়ে জংসন ভেলিকি লুকী তারা পুনরায় দখল করে। লেনিনগ্রাড অবরোধমুক্ত হয় এবং ককেশাস থেকে জার্মানরা পশ্চাদপসরণ করতে থাকে।

দীর্ঘকালের অবরোধ হতে মুক্তির পর লেনিনগ্রাডবাসীদের মধ্যে আবার নতুন উদ্যম ফিরে আসে। অবরুদ্ধ অবস্থায় তাদের অশেষ দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হয়। খাদ্যের অভাব হওয়ায় অতি সামান্য পরিমাণে খেয়েই তারা কোন রকমে জীবনরক্ষা করে। বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং ট্রেণ চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। লোকে তেলের বাতি জ্বালাতে আরম্ভ করে এবং জ্বালানির অভাবে পুরাণ কাঠের ঘরবাড়ী ভেঙ্গে শীতকালে আগুনের ব্যবস্থা করে। সেই অবস্থায় জার্মানরা দূর পাল্লার কামান দেগে সহরের বুকে অহরহ গোলা ফেলতে থাকে। তার ফলে সহরের দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসীদের সরিয়ে আরো অভ্যন্তরে আনতে হয়। কামানের গোলা ছাড়া বিমান হতে বোমাবৃষ্টি তো ছিলই। এই অগ্নিপরীক্ষার মধ্যেও লেনিনগ্রাডবাসীরা অম্লানবদনে সকল কাজ চালিয়ে যায় এবং নগররক্ষায় কোনরূপ শৈথিল্য দেখা দেয় না। তাদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করার জন্য জার্মানরা যত চেষ্টা করেছিল অবশেষে তা সমস্তই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

দ্বিতীয় বর্ষের যুদ্ধে সোভিয়েট বাহিনীর পাল্টা আক্রমণের জের কোথায়

গিয়ে ঠেকবে ঠিক নেই; কাজেই তার ইতিহাস লেখার সময় এখনো আসেনি। কেবল ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর বিপ্লব-বার্ষিকীতে এই অভিযান সম্পর্কে মঃ ষ্ট্যালিন যে বক্তৃতা দেন তা থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করেই এই অধ্যায় শেষ করা যেতে পারে। তিনি বলেন:—

"অনেকে মনে করেন, দক্ষিণে জার্মান ফাসিস্তদের আক্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাকুর তৈলাঞ্চল দখল করা। কিন্তু আসলে তৈলাঞ্চলের দিকে অগ্রসর হওয়া তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল না, ওটা ছিল গৌণ লক্ষ্য। তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মস্কোকে পূবদিক থেকে ঘেরাও করা। তারা চেয়েছিল পশ্চাদ্দিকস্থ সরবরাহের উৎস থেকে মস্কোকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে। বাকুর দিকে তাদের এগিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল আমাদের প্রধান রিজার্ভ সৈন্যদের দক্ষিণে টেনে নেওয়া, মস্কোতে আমাদের বাহিনীকে দুর্বল করা এবং সহজে মস্কো দখল করা। সম্প্রতি আমাদের সৈন্যদের হাতে কতকগুলি জার্মান দলিল পড়েছে। তার মধ্যে একখানি মানচিত্রে দেখা যায়, জার্মানদের অভিপ্রায় ছিল ২৫শে জুলাইর মধ্যে ষ্ট্যালিনগ্রাডে, ১৫ই আগষ্টের মধ্যে কুইবিশেফে এবং ২৫শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে বাকুতে পৌঁছা। মস্কো দখলের পরিকল্পনা সম্বন্ধে আমরা যে সংবাদ পেয়েছিলাম, এই দলিলগুলির দ্বারা তা সমর্থিত হয়।"

মঃ ষ্ট্যালিনের এই অনুমান সত্য হয়ে থাকলে হিটলারের দ্বিতীয়বার মস্কোদখলের চেষ্টাও যে ব্যর্থ হয়েছে তা নিঃসন্দেহেই বলা যায়।

রণাঙ্গনে লাল ফৌজ

একদিন অনেকেরই ধারণা ছিল দুর্মদ জার্মান বাহিনীকে রণাঙ্গনে ঠেকাতে পারে য়ুরোপে এমন কোন শক্তি নেই। কিন্তু সোভিয়েট রাষ্ট্রের লাল ফৌজ লোকের সে ধারণা বদলে দিয়েছে। তারা প্রমাণ

করেছে যে, জার্মান বাহিনী যতই শক্তিশালী হোক, তারা অজেয় নয়। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রকে আক্রমণ করে জার্মানরা তার ক্ষতি যথেষ্টই করেছে, কিন্তু সোভিয়েট সমরসামর্থ্য বিনষ্ট করার যে আশা তারা পোষণ করেছিল সে আশা তাদের পূরণ হয় নি; ক্ষতিগ্রস্ত তাদেরও যথেষ্টই হতে হয়েছে এবং লাল ফৌজের পাণ্টা আক্রমণ অনেকক্ষেত্রেই তাদের বিব্রত করে তুলেছে।

রুশ রণাঙ্গনে এক বছরের যুদ্ধে উভয় পক্ষের ক্ষতি সম্বন্ধে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন মস্কো-বেতারে নিম্নরূপ হিসাব দেওয়া হয়:—

ক্ষতি	জার্মান	সোভিয়েট
হত, আহত, নিখোঁজ সৈন্য	১ কোটি	৪৫ লক্ষ
কামান	৩০,৫০০	২২,০০০
ট্যাঙ্ক	২৪,০০০	১৫,০০০
বিমান	২২,০০০	৯,০০০

মস্কো-বেতারে আরো বলা হয় যে, এক বছরে জার্মানীর অন্তত ৩৫ লক্ষ সৈন্য নিহত হয়েছে। আহত সোভিয়েট সৈন্যদের শতকরা ৭৫ জন আবার সৈন্যদলে যোগ দিতে সক্ষম হয়েছে; কিন্তু আহত জার্মান সৈন্যদের শতকরা ৪৩ জনের বেশী পুনরায় সৈন্যদলে যোগ দিতে পেরেছে কিনা সন্দেহ।

তারপর ২৭শে সেপ্টেম্বর মস্কো থেকে প্রেসিডেণ্ট রুজভেণ্ট প্রেরিত বিশেষ প্রতিনিধি মিঃ উইল্কী এক বিবৃতিতে বলেন:—

"নিহত, আহত ও নিখোঁজ রুশ সৈন্যের সংখ্যা ৫০ লক্ষ হবে। এ ছাড়া হিটলারের করতলগত রুশ এলাকায় অন্তত ৬ কোটি রুশ দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ। আগামী শীতে খাদ্যের বিষম অনটন হবে। শীতকালে লক্ষ লক্ষ লোক ঘরে আগুন রাখবার জন্য জ্বালানি পাবে না।

সৈন্য এবং অত্যাবশ্যক শ্রমিকদের বস্ত্র যুগিয়ে সর্বসাধারণের বস্ত্র



বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে সোভিয়েট গ্রাজুয়েট তরুণী। এরাই আজ সোভিয়েট রাষ্ট্রের শক্তি।

মিলে না বললেই চলে। রুছ দরকারী ওষুধপত্রই নেই। তথাপি

সংকল্পে রুশরা অটুট। তাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা—হয় বিজয়, না হয় মৃত্যু। বিজয়ের কথা ছাড়া তাদের মুখে অন্য কথা নেই। এরেই বলে সত্যিকারের জনযুদ্ধ। লক্ষ লক্ষ রুশ নারী ও বালকবালিকা সমরসম্ভার উৎপাদনের কারখানায় অম্লান বদনে কাজ করে যাচ্ছে। তারাই কৃষিকার্য্য চালাচ্ছে। আট দশ বছরের বালকবালিকারা পর্যন্ত কাজে যোগ দিয়েছে। সক্ষম সাবালক ব্যক্তিমাত্রই হয় সৈন্যদলে যোগদান করেছে, আর তা না হলে কারখানায় সে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এদের যুদ্ধোদ্যম সম্বন্ধে আমি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। নিজের মনে কেবলই প্রশ্ন জাগছে—আমাদের এই শৌর্যশালী মিত্র শক্তিকে কিভাবে সব চেয়ে বেশী সাহায্য করে আমরা জয়লাভের পথ সুগম করতে পারি। আমার নিজের বিশ্বাস, বৃটেনের সহযোগিতায় যত শীঘ্র সম্ভব য়ুরোপে একটি যথার্থ দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলেই সব চেয়ে বেশী সাহায্য করা সম্ভব।"

পুঁজিতন্ত্রী দেশের একজন শিল্পপতির মুখ দিয়েই সোভিয়েট জনসাধারণের দৃঢ়তা সম্বন্ধে এরূপ অকুণ্ঠ প্রশংসা বেরিয়েছে। তারপর রণাঙ্গনেও লাল ফৌজ অন্তত এটা নিঃসন্দেহেই প্রমাণ করেছে যে, জার্মান বাহিনীর তুলনায় তারা রণবিদ্যার দিক দিয়ে কোন অংশেই নিকৃষ্ট নয়। রণনীতি ও রণকৌশলে স্থানে স্থানে তারা শ্রেষ্ঠত্বেরও পরিচয় দিয়েছে। রণাঙ্গনে তারা যেসব বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছে, এখানে সংক্ষেপে তারই আলোচনার চেষ্টা করব।

একটা কথা প্রথমেই বলে নেওয়া ভাল। সোভিয়েট 'ষ্ট্র্যাটেজী' বা রণনীতিই হল প্রথমে বিপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধ এবং ক্রমশ সমস্ত শক্তি সংহত করে শত্রুর বিলোপসাধন। তারই জন্য দীর্ঘকাল যুদ্ধ চালাবার উপযোগী করে তার সমরপ্রস্তুতি। এই রণনীতির ওপর

নির্ভরশীল বলেই সে জানত যে, জার্মান বাহিনী আক্রমণ করলে প্রাথমিক সুবিধা তাদের কিছু হবেই; কারণ রণাঙ্গনে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ণ শক্তি নিয়োজিত করতে কিছু সময় কেটে যাবে। জার্মানী আক্রমণ করবে এই আশঙ্কায় আগে হতেই রণাঙ্গনে সে পূর্ণ শক্তির সমাবেশ করতে পারে না, কারণ সেটা তার রণনীতিবিরুদ্ধ। কাজেই এই শক্তি সমাবেশে তার যে সময় লাগবে, সেই অবসরে প্রতিপক্ষ নিশ্চয়ই সোভিয়েট এলাকায় খানিকটা প্রবেশে সমর্থ হবে এবং তা যে ঠেকান যাবে না লাল ফৌজের কর্তৃপক্ষ তা জানতেন। জানতেন বলেই তাঁরা পূর্বাহ্নেই সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম এলাকায় কিভাবে প্রয়োজন হলে "পোড়ামাটি" নীতি অবলম্বন করা যাবে তার সব ব্যবস্থা ঠিক করে রেখেছিলেন। সেটা তাঁরা রাতারাতি ঠিক করেন নি; সোভিয়েট সমরপ্রস্তুতিতে সেটা একটা সুচিন্তিত পরিকল্পনা। সেই জন্যই ফসল থেকে আরম্ভ করে গোলাবারুদ, কলকারখানা পর্যন্ত এই যুদ্ধের মধ্যে তাদের পক্ষে অন্যত্র সরান সম্ভব হয়েছে। যেগুলি সরান সম্ভব হবে না সেগুলিকে ধ্বংস করার পরিকল্পনাও আগেই করে রাখা হয়েছিল। এই "পোড়ামাটি" নীতি অবলম্বনে লাল ফৌজের 'স্যাপার্স' বা এঞ্জিনীয়ার বাহিনী যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে, নিম্নের উদাহরণ থেকেই তা ভাল বোঝা যাবে।

১৯৪১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে জার্মানরা যখন ক্রিমিয়া দখলে উদ্যত তখন একটি খবর পাওয়া গেল যে, লাল ফৌজ বেতারসাহায্যে দূর থেকে বারুদখানা উড়িয়ে দেবার এক নতুন কৌশল বের করেছে এবং এইভাবে অনেক স্থলে তারা বারুদখানা উড়িয়েও দিচ্ছে। তার ফলে গুপ্ত বারুদখানার সন্ধান করতে গিয়ে বহু জার্মানের জীবন বিপন্ন হচ্ছে। এর আগে যখন কিয়েফের পতন হয় তখনো এক খবর পাওয়া

গিয়েছিল যে, জার্মানরা কিয়েফে প্রবেশের পর কয়েকদিন ক্রমাগত মাইন ফাটতে আরম্ভ করল এবং তার ফলে সহরের অবস্থা এমনি শোচনীয় হয়ে দাঁড়াল যে, জার্মানরা আবার সহর ছেড়ে যেতে বাধ্য হল। তারপর জার্মান 'স্যাপাররা' গিয়ে খুঁজে বের করল যে কোথায় কোথায় গুপ্ত মাইন পাতা রয়েছে। তারা মাইন কুড়ায়ে সহর বিপন্মুক্ত করলে তবে জার্মান সৈন্যরা আবার কিয়েফে প্রবেশ করে। তারই কিছুদিন আগে আর একটা খবর আসে যে, সোভিয়েট বাহিনী অরণ্যে আগুন লাগাবার জন্যে এক প্রকার নতুন কামানের গোলা আবিষ্কার করেছে। কোনও স্থান ত্যাগ করতে হলে তারা সেই অঞ্চলের অরণ্যে আগুন লাগাবার উদ্দেশ্যে দূর হতে কামান দেগে এই নতুন গোলা বর্ষণ করে এবং গোলাগুলি পড়েই জ্বলতে থাকে, ফলে সমগ্র অরণ্যে দাবানল জ্বলে ওঠে। প্রতিপক্ষ যাতে এসে অরণ্যসম্পদ লাভ না করতে পারে এবং তাদের অগ্রগতিতে যাতে বিঘ্ন ঘটে তদুদ্দেশ্যেই এরূপ করা হয়।

এ থেকেই বোঝা যায়, "পোড়ামাটি" নীতি অবলম্বনে লাল ফৌজ কতখানি তৎপরতা ও কৃতিত্ব দেখিয়েছে।

তারপর রণকৌশলের দিক দিয়েও লালফৌজ নতুনত্ব না দেখিয়েছে এমন নয়। পশ্চিম য়ুরোপের যুদ্ধে লোকের মনে ধারণা জন্মেছিল, জার্মান সাঁজোয়া বাহিনীর 'পানৎসার' ডিভিসনগুলি বুঝি অজেয় এবং অভেদ্য। কিন্তু রুশ রণাঙ্গনে এই 'পানৎসার' ডিভিসনগুলিকে কাবু করার জন্য লাল ফৌজ দুটি চমৎকার কৌশল অবলম্বন করে। তারা অনেকক্ষেত্রেই জার্মান 'পানৎসার' য়ুনিটগুলিকে বিনাবাধায় অগ্রসর হতে দেয়। সেগুলি নিশ্চিন্তে অনেক দূর অগ্রসর হলে পর অকস্মাৎ রুশ সাঁজোয়া বাহিনী গুপ্ত স্থান হতে বেরিয়ে পশ্চাদ্দিকস্থ অপেক্ষাকৃত

মন্থরগতিসম্পন্ন জার্মান পদাতিক বাহিনীকে আক্রমণ করে। সোভিয়েট ট্যাঙ্কবহরের এই আক্রমণমুখে পড়ে জার্মান পদাতিক বাহিনী বিভ্রান্ত ও ছত্রভঙ্গ হয়। সামনের 'পানৎসার' য়ুনিটগুলিকে নির্বিবাদে অগ্রসর হতে দেখে তারা ধারণাই করতে পারে না যে, তাদের ওপর এরূপ আকস্মিক আক্রমণ হতে পারে। পশ্চাদ্দিকস্থ মূল পদাতিক বাহিনী হতে বিচ্ছিন্ন হবার ফলে সম্মুখস্থ 'পানৎসার' য়ুনিটগুলি স্বভাবতই দুর্বল হয়ে পড়ে।

এর চেয়ে আরো একটি চমৎকার কৌশল লাল ফৌজ সময় সময় অবলম্বন করে থাকে। সাধারণত সন্ধ্যার পরে সোভিয়েট মোটর-সজ্জিত বাহিনী অন্ধকারে জার্মান বাহিনীর পশ্চাতে গিয়ে ভিড়ে পড়ে। তারপর সুবিধাজনক স্থানে উপস্থিত হলে সুযোগ বুঝে সোভিয়েট সেনা সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয় দিক হতে প্রতিপক্ষের ওপর আক্রমণ চালায়। অন্ধকারে উভয় দিক হতে অপ্রত্যাশিত আক্রমণের ফলে জার্মান বাহিনীতে বিষম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। কে শত্রু, কে মিত্র, তারা চিনে উঠতে পারে না। কিন্তু লালফৌজের সে অসুবিধা হয় না; কারণ কলকাঠি ও আটঘাট তাদের সব আগে হতেই ঠিক করা থাকে।

বলা বাহুল্য, রুশিয়ার অরণ্যপ্রধান অঞ্চলেই এসব কৌশল অবলম্বনে সুবিধা হয়; উন্মুক্ত প্রান্তরের যুদ্ধে এসব কৌশল খাটে না।

এ গেল কৌশলের কথা। লাল ফৌজের নির্ভীকতা এবং দৃঢ়তার কথাও আজ আর কারো অবিদিত নেই। খারকফের যুদ্ধে সোভিয়েট পদাতিক বাহিনী যে দৃঢ়তার পরিচয় দেয় তা অতুলনীয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম পর্বে সাধারণত দেখা যায়, ট্যাঙ্ক ঠেকাবার জন্য ট্যাঙ্কই নিয়োজিত হয়েছে; ট্যাঙ্কধ্বংসী পদাতিক সেনা সেগুলিকে সাহায্য করেছে মাত্র। কিন্তু খারকফের যুদ্ধে যখন সোভিয়েট পক্ষের বিস্তর ট্যাঙ্ক খোয়া যায়, তখন লাল ফৌজ এই নিয়মের

ব্যতিক্রম করে জার্মান ট্যাঙ্ক-আক্রমণের প্রথম চোট সামলাবার জন্য ট্যাঙ্কধ্বংসী পদাতিকসেনা নিয়োজিত করে। তাদের সঙ্গে এক দফা



রণাঙ্গনে সোভিয়েট গোলন্দাজ বাহিনী। যুদ্ধক্ষেত্রে সোভিয়েট গোলন্দাজরা বিস্ময় স্থাপন করেছে।

যুদ্ধ হয়ে যাবার পর সোভিয়েট ট্যাঙ্কবাহিনী এসে পাল্টা আক্রমণ চালায়। এতে পদাতিক বাহিনীর যে কতখানি দৃঢ়তা দরকার তা বোধ হয় না বললেও চলে।

লাল ফৌজের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল তার অশ্বারোহী ও স্কী-বাহিনী। যন্ত্রসজ্জার ফলে অন্যান্য দেশে অশ্বারোহী বাহিনী একরূপ লোপ পেতে বসেছে; কিন্তু রুশ রণাঙ্গনে সেদিনও লাল ফৌজের অশ্বারোহী দল যে কৃতিত্ব দেখিয়েছে, তাতে মনে হয় তার প্রয়োজন অদ্যাবধি শেষ হয় নি। বিশেষ করে জলাভূমিতে যখন ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়ী চালাতে অসুবিধা হয় তখন সেখানে একমাত্র অশ্বারোহী দলই দ্রুতগতিতে ছুটে গিয়ে প্রতিপক্ষের ওপর আক্রমণ চালাতে পারে। তাছাড়া আরণ্য অঞ্চলে গা ঢাকা দিয়ে হঠাৎ শত্রুকে আক্রমণ করতেও অশ্বারোহী দলের সুবিধা। কয়েক ক্ষেত্রে জার্মান সাঁজোয়া বাহিনীকে রুশ অশ্বারোহী দলের অতর্কিত আক্রমণে যথেষ্ট বিব্রত ও ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে। প্রথম বর্ষের অভিযান চালাবার সময় শীতকালে সোভিয়েট স্কী-বাহিনীর দ্বারা জার্মানরা নাস্তানাবুদ কম হয়নি। রুশ রণাঙ্গনে প্রবল তুষারপাতে বরফ জমায় জার্মানরা যখন আত্মরক্ষাব্যূহে কোন রকমে টিঁকে থাকবার চেষ্টা করে, সোভিয়েট স্কী-বাহিনী তখন বরফের ওপর দিয়ে ছুটে এসে তাদের ওপর ভীষণভাবে আক্রমণ চালায়। জার্মানরা নিরুপায়, তাদের স্কী-বাহিনী নেই। কাজেই কোথাও বাধ্য হয়ে তারা পশ্চাদপসরণ করে, কোথাও স্কী-বাহিনীর আকস্মিক আক্রমণে তারা বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্কীর সাহায্যে সোভিয়েট বাহিনী রণাঙ্গনে কেবল কামানবন্দুকই যে চালায় এমন নয়, সৈন্যদের জন্য রসদাদিও আনায়। বরফের ওপর তাদের যুদ্ধ করতে দেখে জার্মানরা অনেকক্ষেত্রেই বিস্মিত হয়।

অতঃপর সোভিয়েট নৌ ও বিমান বাহিনী সম্বন্ধে দু'চার কথা বলেই উপসংহারে আসব। সোভিয়েট বিমান বাহিনীর সব চেয়ে কৃতিত্ব হল এই যে, এত বড় একটা রণাঙ্গনের কোন স্থানেই জার্মান বিমান

বাহিনী প্রাধান্য লাভ করতে পারে নি। অথচ এই বিমানবলই ছিল জার্মানীর গৌরব। সর্বত্র সোভিয়েট বিমান বাহিনী সোভিয়েট স্থল-সেনাকে এমনভাবে সাহায্য করেছে এবং পাহারা দিয়েছে যে, জার্মান বিমান বাহিনীকেও বাধ্য হয়ে স্বপক্ষের স্থলসেনাকে সাহায্য করার জন্য সমস্ত রণাঙ্গনে ছড়িয়ে থাকতে হয়েছে। এ জন্যই বোধ হয় লেনিনগ্রাড ও মস্কোর এত কাছে গিয়েও জার্মান 'লুফৎভাফে' তেমন-ভাবে হানা দেবার সুযোগ বা অবসর পায় নি। স্থলযুদ্ধ চালিয়ে স্বতন্ত্রভাবে কোথাও জোর হানা দেবার মত অতিরিক্ত বিমানবল যে জার্মানীর ছিল না, একথা রুশ রণাঙ্গনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে অনেকেই বলেছেন।

সোভিয়েট ফাইটার বাহিনী যে দুর্ধর্ষ যোদ্ধা এর প্রমাণও বহু ক্ষেত্রেই পাওয়া গেছে। তারা কিরূপ মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করে একটি দৃষ্টান্ত থেকেই তা বোঝা যাবে। রুশ বিমানযোদ্ধারা যখন দেখে যে, প্রতিপক্ষের বিমানকে গুলীগোলা ছুঁড়ে আর কোনক্রমেই কাবু করার উপায় নেই তখন তারা নিজেদের বিমান নিয়ে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে গিয়ে প্রতিপক্ষের বিমানে সোজা ঘা মারে। নিজেদের ধ্বংস নিশ্চিত জেনেও এভাবে বিপক্ষের ক্ষতিসাধনে তারা পরাঙ্মুখ হয় না। পন্থাটা অত্যন্ত মারাত্মক হলেও প্রয়োজনক্ষেত্রে তারা এ রণকৌশল অবলম্বন করে থাকে। সাবেককালে নৌযুদ্ধে জাহাজের ওপর জাহাজ চালিয়ে এরূপ ramming করা হত। সোভিয়েট বাহিনী কর্তৃক আধুনিক বিমানযুদ্ধেও বিমান দিয়ে বিমানকে এভাবে ram করা সত্যই বিস্ময়কর।

বিমানযুদ্ধে লাল ফৌজের দান অসামান্য। প্যারাশুট বাহিনীর প্রবর্তন তারাই প্রথম করে এবং ট্যাঙ্ক ও সৈন্যবাহী বিমানচালনা

তারাই আগে পরীক্ষা করে দেখে। সম্প্রতি সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ রেড ক্রসের শুশ্রূষাকারিণীদের প্যারাশুটের সাহায্যে নামাবার ব্যবস্থা করেছেন। বলা বাহুল্য, এও এক অভিনব পন্থা।

সোভিয়েট নৌবাহিনীর গুরুত্ব অন্যান্য প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রগুলির তুলনায় কম। তবে প্রয়োজনানুরূপ ব্যবস্থা করতেও যে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ ত্রুটি করেন নি তার প্রমাণ বল্টিক ও কৃষ্ণসাগরের দিকে তাকালেই মিলে। বহু চেষ্টা করেও বল্টিকের পথে লেনিনগ্রাড অভিযানে জার্মান নৌবাহিনী সুবিধা করতে পারেনি এবং কৃষ্ণসাগরে অদ্যাবধি সোভিয়েট নৌবহরের প্রাধান্য বিদ্যমান। সাইবেরিয়ার দিকে তার নৌবল কিরূপ রুশ-জাপান যুদ্ধ না বাধলে তা বোঝা যাবে না ; তবে জাপান ও সাইবেরিয়ার মধ্যবর্তী দরিয়ায় যে সোভিয়েট সাবমেরিণ বিস্তর রয়েছে সেকথা আর গোপন নেই।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে লাল ফৌজ জগতে বিস্ময় স্থাপন করেছে। কেবল রণনীতি ও রণকৌশলে নয়, আধুনিক মারণাস্ত্র আবিষ্কার, তার নির্মাণ এবং চালনানৈপুণ্যেও সোভিয়েট শক্তি নতুন দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে। নতুন সোভিয়েট বোমা "মলোটফের ঝুড়ির" কথা অনেকেই শুনে থাকবেন। তারপর সেদিনও এক নতুন সোভিয়েট মারণাস্ত্রের খবর বেরিয়েছে। এমন একটা অস্ত্র তারা উদ্ভাবন করেছে যা থেকে এক সঙ্গে ৪২টি ছোট গোলা বেরুয়। জার্মানরা এক স্থানে একটা এই নতুন অস্ত্র হস্তগত করেছে এবং তারা পরীক্ষা করে দেখছে যে, জার্মানীতেও তা তৈরী করা যায় কিনা। যুদ্ধ আরো দীর্ঘকাল চললে এরূপ আরো নতুন নতুন অস্ত্রের সন্ধান পাওয়া কিছু বিচিত্র নয়।

তারপর সোভিয়েট সৈন্যদের ব্যক্তিগত বীরত্ব এবং স্বদেশপ্রেমের কাহিনীও এপর্যন্ত অনেকই শোনা গিয়েছে। কেবল পুরুষ নয়,

নারীও সেখানে পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে অমিত বিক্রম ও অতুলনীয় শৌর্যের পরিচয় দিচ্ছে। কিছুদিন আগে মস্কোতে সামরিক কায়দায় সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান প্রদর্শন করে সোভিয়েট রাষ্ট্রের তরফ থেকে প্রসিদ্ধ নারী বৈমানিক মেজর মারিনা রাসকোভার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর মস্কোতে রাষ্ট্রের তরফ হতে কারো অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া



রণক্ষেত্রে একজন আহত সৈনিক ক্রোড়ে সোভিয়েট স্বেচ্ছাসেবিকা

এই প্রথম। মেজর রাসকোভা এক ডাইভ-বোমারু বিমান বাহিনীর অধিনায়িকা ছিলেন। রণাঙ্গনে তিনি প্রাণ হারান এবং শেষ সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাঁর মৃতদেহ মস্কোতে নেওয়া হয়। সেখানে সহস্র সহস্র মস্কোবাসী তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

এবার এক সোভিয়েট যোদ্ধা মৃত্যুকালে স্বদেশপ্রেমের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যান তাঁর কথা বলেই বক্তব্য শেষ করব। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে সোভিয়েট বাহিনী পুনরায় য়ুক্রেনের পূর্ব সীমান্তে এসে উপনীত হয়। খৃষ্টীয় বড়দিনের সকালবেলা লাল ফৌজ যখন সীমান্ত অতিক্রম করে য়ুক্রেনে পুনঃপ্রবেশের জন্য প্রথম আক্রমণ চালায় তখন শত্রুর গুলীতে য়ুক্রেনের এক তরুণ লেফ্‌টেনাণ্ট আহত হন। আহত হয়েও তিনি এগিয়ে যেতে থাকেন। দ্বিতীয় বার তিনি আহত হন, কিন্তু থামেন না। পথ চলেন আর বলতে থাকেন, "আমি য়ুক্রেনে যাচ্ছি।" তারপর সীমান্ত পেরিয়ে য়ুক্রেনের প্রথম গ্রামে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গেই বিপক্ষের এক কামানের গোলার ভাঙ্গা টুকরা এসে তাঁকে ধরাশায়ী করে। অতিকষ্টে মাথা তুলে তিনি একবার তাকান এবং দু'হাত বাড়িয়ে য়ুক্রেনের কালো মাটি স্পর্শ করে ক্ষীণকণ্ঠে এই বলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, "আমার য়ুক্রেন, আমার প্রিয় জন্মভূমি।"

একা নয়, যে ভূমিতে এমন লক্ষ লক্ষ দেশপ্রেমিকের জন্ম, সেখানে যদি শেষ পর্যন্ত তার শত্রুর কণ্ঠেই বিজয়লক্ষ্মী জয়মাল্য অর্পণ করেন তবে তাঁর সেই পক্ষপাতিত্বের জন্য ভবিষ্যতে ইতিহাস-রচয়িতারা নিশ্চয়ই একবার বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়ে ভাববেন—নিয়তির একি নিষ্ঠুর পরিহাস!

গ্রন্থপঞ্জী

এই পুস্তক প্রণয়নে বিভিন্ন দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকা বাদে প্রধানত নিম্নের গ্রন্থসমূহ হতে সাহায্য গৃহীত হয়েছে :—

Soviet Geography—by N. Mikhaylov, lecturer, Moscow Stalin Institute of Transport Engineers.

Russia without Illusions—by Pat Sloan.

Russia in Peace & in War—by Pat Sloan.

Russia Resists—by Pat Sloan.

Russia—by Bernard Pares.

Women in Soviet Russia—by Fannina W. Halle.

Women in the Soviet East—by Fannina W. Halle.

Light on Moscow—by D. N. Pritt.

Must the War Spread—by D. N. Pritt.

The Military Strength of the Powers—by Max Werner

Battle for the World—by Max Werner.

From Tobruk to Smolensk—by Strategicus .

The War Moves East—by Strategicus.

Horrabin's Atlas-History of the Second Great War.
